মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায়

মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায়

কনটেমপোরারী
পাবলিশার্স (প্রাঃ) লিমিটেড
কলিকাতা

প্রথম প্রকাশ
পৌষ ১৩৬৯
জানুয়ারী, ১৯৬৩

প্রকাশক :

রথীন মিত্র
কন্‌টেম্‌পোরারী পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
৬৫, রাজা রাজবল্লভ ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৩
১২, নেতাজী সুভাষ রোড,
কলিকাতা-১

মুদ্রাকর :

নির্মলেন্দু দাশগুপ্ত
মেট্রোপলিটান প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস প্রাঃ লিঃ
৭, চৌরঙ্গী রোড,
কলিকাতা-১

মূল্য : সাড়ে পাঁচ টাকা

প্রকাশকের নিবেদন

উনবিংশ শতকের শেষার্ধ আধুনিক বাঙালী জাতি তথা ভারতের ইতিহাসের এক সুবর্ণ যুগ। ঐ সময় ধর্ম, দর্শন, সাহিত্য, বিজ্ঞান, চারুকলা ও কারুশিল্প এবং রাজনীতিতে বাঙালীর জ্ঞানসাধনা ও কর্মসাধনা ভারতে এক নবযুগ আনয়ন করে। উচ্চ আদর্শবোধ ও গভীর মননশীলতা ছিল ঐ যুগের শিক্ষিত বাঙালী চরিত্রের বৈশিষ্ট্য এবং গভীর দেশপ্রীতি সে যুগের বাঙালী তরুণদের অনুপ্রাণিত করেছিল। দেশের গৌরবময় ঐতিহ্যের নিদর্শন বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরার প্রবল আকাঙ্ক্ষায় সে যুগের তরুণ হৃদয় উদ্বেলিত হয়ে উঠেছিল। এই ভাব বিপ্লব ও নবজাগরণের যুগে ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় জন্মগ্রহণ করেন। যৌবনের প্রারম্ভে তিনি স্বামী বিবেকানন্দ, সিস্টার নিবেদিতা, স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী যোগানন্দ, স্বামী শিবানন্দ, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় ও শ্রীঅরবিন্দের ঘনিষ্ট সংস্পর্শে আসেন এবং এই মহাপুরুষদের শিক্ষা ও জীবনাদর্শই তাঁকে গভীর স্বদেশপ্রেম ও দেশের গৌরবময় ঐতিহ্যের প্রতি সুগভীর মমত্ববোধে অনুপ্রাণিত ক'রে তাঁর জীবন ও কর্মসাধনাকে প্রভাবিত করে। ব্যক্তিগত জীবনে মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় ছিলেন একজন প্রখ্যাত এঞ্জিনিয়ার এবং উচ্চ পদে প্রতিষ্ঠিত থেকে তাঁর যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছিলেন। কিন্তু এ তাঁর বাইরের পরিচয়; তিনি ছিলেন এক আদর্শবাদী মননশীল পণ্ডিত এবং প্রত্নতত্ত্ব ও ভারতীয় স্থাপত্য শিল্পের রীতি ও ধারা সম্বন্ধে তাঁর অভিমত আজও অভ্রান্ত পরিগণিত হয়ে ভারতীয় স্থাপত্যের পাঠকের কাছে তাঁকে পথিকৃৎ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। সারাজীবন তিনি নিরলস বিদ্যাচর্চা ও নানা দুরূহ

বিষয় সম্বন্ধে গবেষণা করেন। তিনি সংস্কৃত সাহিত্যে, দর্শনে ও বেদান্তে বিশেষ পণ্ডিত ছিলেন এবং 'পণ্ডিত' ও 'বিদ্যারত্ন' উপাধিতে ভূষিত হন।

উড়িষ্যার স্থাপত্য সম্বন্ধে তাঁহার দীর্ঘকালের গবেষণাগ্রন্থ "Orissa and Her Remains—Ancient and Mediæval" ১৮১২ সালে প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বের বিদগ্ধ সমাজের সামনে সর্বপ্রথম প্রমাণিত হয় যে ভারতীয় দেবদেউলের স্থাপত্য রীতি পাশ্চাত্যের আদৌ অনুকরণ নয়; এগুলো খাঁটি আর্য তথা ভারতীয় সভ্যতার মৌলিক নিদর্শন।

মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সঙ্গে ঘনিষ্টভাবে জড়িত ছিলেন এবং তিনিই বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে সাহিত্য পরিষদের মিউজিয়াম ও চিত্রশালা সংগঠন করে "A Study and Handbook of Sculpture in the Sahitya Parishad Museum" নামক বইটি সম্পাদন করে সাহিত্য পরিষদের প্রতি তাঁর গভীর মমত্ববোধের ও তাঁর পাণ্ডিত্যের পরিচয় দেন; আজ পর্যন্ত ঐ পুস্তকটির পুনঃসঙ্কলন সম্ভব হয়নি। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ও Indian Museum-এর Archaeology-র অনারারী লেক্‌চারার ছিলেন এবং জাতীয় শিক্ষা পরিষদ, যাদবপুর-এর সঙ্গে (National Council of Education, Bengal) স্থাপনার সময় থেকে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন; প্রসঙ্গত যাদবপুর কলেজের ও হোস্টেলের প্রথম যুগের সমস্ত বাড়ী তাঁরই নক্সা ও পরিচালনায় নির্মিত হয়।

প্রত্নতত্ত্ব গবেষণা ও পাণ্ডিত্যের মধ্যেই যে কেবলমাত্র মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায়ের কার্যাবলী নিহিত ছিল তা নয়; বিজ্ঞান, সাহিত্য, ভ্রমণ, মূর্তিতত্ত্ব, এবং অন্যান্য বহু বিষয়ে তিনি যে সব পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধ লেখেন সেগুলি Asiatic Society Journal, Behar and Orissa Research Society Journal, Dacca Review, Mohabodhi Journal, সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, উদ্বোধন, সাহিত্য, নারায়ণ, ভারতবর্ষ, প্রবাসী প্রভৃতি বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ছড়িয়ে আছে। তাঁর বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ছড়ানো এই সব নিবন্ধ এবং বহু অপ্রকাশিত লেখার

পাণ্ডুলিপি সংগৃহীত হয়ে প্রকাশিত হলে বাংলা সাহিত্যের চিন্তাশীল পাঠকের কাছে এক নতুন দিকের জ্ঞান চর্চার দ্বার খুলে যাবে; কেন না বাংলা সাহিত্যে প্রত্নতত্ত্ব, মূর্তিতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে গবেষণালব্ধ রচনা নেই বল্লেই চলে এবং পুস্তকের সংখ্যাও নগণ্য।

তাঁর রচিত "স্থাপত্য শিল্পের ভূমিকা" পাঠক সমাজে বিশেষ সমাদর লাভ করেছে। স্বামী বিবেকানন্দের জীবনাদর্শের প্রতি তাঁর অন্তরের অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা তিনি তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ "The Swami Vivekananda—A Study"-তে নিবেদন করেছেন। এই গ্রন্থে তিনি যে নতুন দৃষ্টিভঙ্গী আরোপ করেছেন তাঁর পূর্বে কোন লেখকের লেখায় এ পর্যন্ত তা দেখা যায়নি। তাঁর লেখা অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে শ্রুতি-স্মৃতি পাঠ করলে পাঠক-সমাজ বুঝতে পারবেন যে তিনি কত বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠান ও গণ্যমান্য ব্যক্তির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষা করেছেন। তার মধ্যে রামকৃষ্ণ মিশন, সারদামঠ, মহাবোধি সোসাইটি, বঙ্গীয় বৌদ্ধ সমিতি, Asiatic Society, Calcutta University এবং বাংলাদেশের তদানীন্তন বহু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

আমাদের দেশের সাম্প্রতিক কালের সংস্কৃতিবানদের মধ্যে অনেকে হয়ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় নামের সঙ্গে পরিচিত নন। কিন্তু প্রত্নতত্ত্ব বিষয়ে অনুসন্ধিৎসু ও অনুরাগী ব্যক্তিরা জানেন প্রাচীন ভারতীয় শিল্পকলা ও স্থাপত্য বিদ্যার অনুশীলনে তাঁর দান কতখানি। তাঁর এই দানের স্বীকৃতি তিনি বর্তমান শতকের গোড়ার দিকে বিশিষ্ট ঐতিহাসিক ও প্রত্নতত্ত্ববিদদের কাছ থেকেও পেয়েছিলেন। আমাদের দুর্ভাগ্য যে মাত্র ৪৩ বৎসর বয়সে তাঁর অকাল মৃত্যুতে ভারতীয় শিল্পকলা ও স্থাপত্যবিদ্যায় তাঁর পরিণত চিন্তার অসামান্য অবদান থেকে আমরা বঞ্চিত হলাম। তাঁর বহু আরব্ধ কাজ অসমাপ্ত রেখেই ইহলোক থেকে তিনি বিদায় নিয়েছেন।

দুটি কারণে এর প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা আমরা অনুভব করেছি। প্রথম

কারণ হল—বাংলা ভাষায় প্রাচীন ভারতীয় স্থাপত্য শিল্প সম্বন্ধে বই বিশেষ নেই ; মনে হয় লেখক এই বইখানাতে সে অভাব পূরণ করার পরিকল্পনা করেছিলেন। বইখানার কলেবর ও বিষয়-বিস্তৃতি সম্বন্ধে তাঁর সম্পূর্ণ সিদ্ধান্ত আজ আর জানবার উপায় নেই। তা না জানলেও প্রাচীন শিল্প বিদ্যা সম্বন্ধে বাংলা ভাষায় এরকম একখানা বই প্রকাশের সার্থকতা আছে, বিশেষ করে আজকের দিনে। বাংলা ভাষায় অনুশীলনীয় বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য ও পরিধি ক্রমেই যখন বাড়ছে তখন কেবল সাহিত্য সমৃদ্ধির জন্যেই এই নাতিদীর্ঘ বইখানির সংযোজন যথেষ্ট প্রয়োজন বলে আমরা মনে করি।

দ্বিতয় কারণ হল—স্বাধীনতা লাভের পর আমাদের দেশের সংস্কৃতি ও শিল্পকলার অনুশীলনে একটা নতুন উদ্দীপনার সঞ্চার হয়েছে। তা হওয়া অনিবার্য ; এতকাল যেন আমরা পরের মুখে শুনে স্বদেশের ঐতিহ্য বিচার করেছি। ইউরোপীয় পণ্ডিতদের বক্তব্য ও ব্যাখ্যা বেদবাক্যের মত মেনে নিয়েছি। নিজেদের চোখ মন বা বুদ্ধি দিয়ে বিচার করবার চেষ্টা আমরা এতকাল করিনি। আজ আমাদের জাতীয় চেতনায় সে অনুসন্ধিৎসা জেগেছে ; আমরা দেশের দেব দেবী, দেউল মন্দির ইত্যাদির বিচার বিশ্লেষণের জন্যে উদ্‌গ্রীব হয়েছি। এ লক্ষণ শুভ ; একে সাংস্কৃতিক 'রেনেসাঁস' বললেও ভুল হয় না। এই সময় প্রত্নতত্ত্বানুরাগীরা ছাড়াও দেশের বহু সাধারণ মানুষও 'উড়িষ্যার দেব-দেউল' সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসু। এই ধারণার বশবর্তী হয়েই আমরা বইটা প্রকাশ করছি।

প্রসঙ্গত প্রশ্ন জাগবে যে উড়িষ্যার দেব দেউল সম্বন্ধে বাংলাদেশের লোকের কৌতূহল ও অনুরাগের কি কারণ থাকতে পারে। এই প্রশ্নের স্বতঃস্ফূর্ত উত্তর হল যে বাংলার সঙ্গে উড়িষ্যার সংস্কৃতির একটা ঘনিষ্ট ও প্রত্যক্ষ সম্পর্ক আছে। উড়িষ্যার দেবদেউল ও শিল্পকলার সঙ্গে বঙ্গবাসীর অন্তরঙ্গ পরিচয় থাকলে সেই অনিবার্য সম্পর্ক উপলব্ধি করা সহজ হবে। বৌদ্ধধর্ম, তন্ত্র, বৈষ্ণব-ধর্ম ইত্যাদির ক্ষেত্রে বাংলা ও উড়িষ্যার ঐতিহাসিক সম্পর্ক কতকটা রক্তমাংসের

সম্পর্ক। উড়িষ্যার দেবদেউলের প্রভাব যে বাংলার দেবালয় স্থাপত্যে কতখানি প্রভাব বিস্তার করেছে তাও আজ অনুসন্ধানের যোগ্য। বাংলা-বিহার-উড়িষ্যা বহুকাল এক রাজ্যের মতো শাসিত হয়েছে। বঙ্গাধিপতিরা উড়িষ্যায় এবং উড়িষ্যাধিপতিরা বাংলাদেশে শাসনাধিকার বিস্তার করেছেন। রাষ্ট্রিক যোগাযোগের মাধ্যমে সাংস্কৃতিক যোগাযোগের ধারা দুটি দেশেই একাকার হয়ে গেছে। সুতরাং উড়িয়া-সংস্কৃতির ইতিহাস বঙ্গসংস্কৃতির ইতিহাসেরই পরিপূরক। 'উড়িষ্যার দেব-দেউল' তাই বাঙালীরও পাঠ্য।

উড়িষ্যার স্থাপত্যকলা সম্বন্ধে মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায়ের ***magnum opus*** হল—Orissa and Her Remains, Ancient and Mediæval—১৯১২ সনে প্রকাশিত, জাস্টিস উড্রফের ভূমিকা সম্বলিত। রাজেন্দ্রলাল মিত্রের Antiquities ও হান্টারের বই ছাড়া এ বিষয়ে আগে কেউ লিখেছেন কিনা আমরা জানি না। রিসার্চ সোসাইটির জার্নালাদিতে হয়ত উড়িষ্যার দেব-দেউল বিষয়ে কিছু নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে কিন্তু মনোমোহনের মতো ঐতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টির সমন্বয় কারও রচনায় হয়েছে বলে মনে হয় না। অন্ততঃ আজ থেকে ৫০ বছর আগে প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণা কোন পর্যায়ে সীমাবদ্ধ ছিল তা মনে রাখলে নিতান্ত আত্মাভিমানী ঐতিহাসিকও এই লেখকের অসাধারণ অন্তদৃষ্টি ও বৈজ্ঞানিক বীক্ষণশক্তির প্রশংসা না করে পারবেন না। বাংলায় "উড়িষ্যার দেব-দেউল" গ্রন্থ লেখকের এই বৃহৎ গ্রন্থেরই স্বকৃত সার সংকলন বলা চলে। উড়িষ্যার রাজবংশের বৃত্তান্ত, ভুবনেশ্বর, পুরী, কোণারক প্রভৃতি স্থানের বিখ্যাত মন্দিরগুলির বিস্তারিত বিবরণ ও স্থাপত্যকলার বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ এই বই-এর প্রতিপাদ্য। গত ৫০ বছরের গবেষণায় প্রাচীন ইতিহাসের অনেক নতুন উপকরণ পাওয়া গেছে কিন্তু তার জন্যে উড়িষ্যার মন্দিরের স্থাপত্যকলা বদলায়নি। এই বইতে সেই স্থাপত্যকলার বিবরণ দেওয়া হয়েছে। রাজবংশাদির বিবরণে হয়ত কোন নতুন তথ্য উদ্ঘাটিত হয়ে কিছু অদল বদল হতে পারে। বর্তমানের হুঁসিয়ার পাঠক তা স্বচ্ছন্দে সংশোধন করে নিতে পারেন।

অবশ্য তাতে আসল বিষয়বস্তু আয়ত্ত্ব করতে বেগ পেতে হবে না। আমরা সাহস করে বলতে পারি যে উড়িষ্যার দেবালয় স্থাপত্যের মনোজ্ঞ বিবরণে ও বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে আজও এই লেখকের জুড়ি আছেন কিনা সন্দেহ। এই কারণে আমরা আশা করি বইখানি বাংলাদেশের সকল শ্রেণীর পাঠকের কাছে আদর পাবে।

এই পুস্তকটি প্রকাশের জন্যে যাঁদের অকুণ্ঠ সাহায্য আমাদের কৃতজ্ঞতাপাশে বন্ধ করেছে তাঁদের নাম প্রকাশ না করে পারছি না। তাঁরা হলেন—অধ্যাপক ত্রিদিবনাথ রায়, শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ সামন্ত, শ্রীবিনয় ঘোষ, শ্রীপূর্ণেন্দু ভট্টাচার্য ও শ্রীসন্তোষকুমার ঘোষ। পরিশেষে আমরা স্বর্গগত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায়ের সুযোগ্যা সহধর্মিণী স্বর্গীয়া বিজলীবালা দেবীকে আমাদের আন্তরিক শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করছি। অল্পকাল হল তিনি লেখকের বহু মূল্যবান পাণ্ডুলিপি আমাদের কাছে রেখে পরলোক গমন করেছেন। সেগুলি আমরা সুধী পাঠকসমাজকে সুযোগ মত পরিবেশন করার আশা পোষণ করি।

জগন্নাথদেবের মন্দির—পুরী

উড়িষ্যার প্রস্তরশিল্পে সূক্ষ্ম কারুকার্যের নিদর্শন
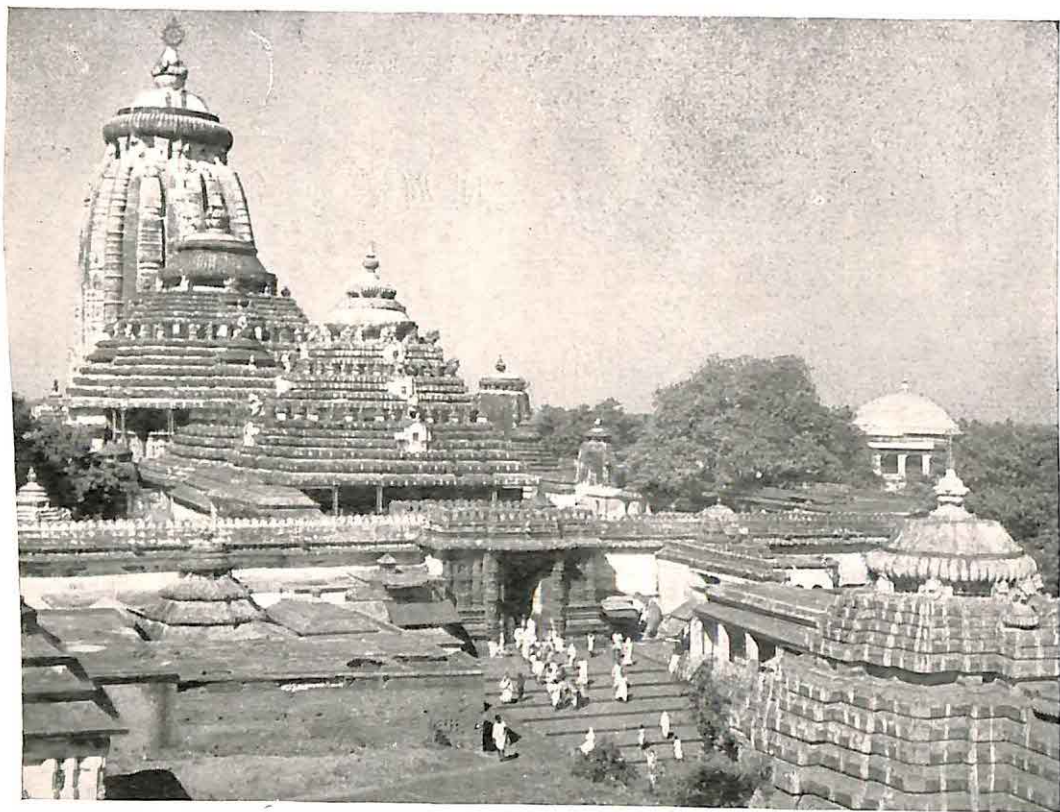
লিঙ্গরাজ মন্দির—ভুবনেশ্বর
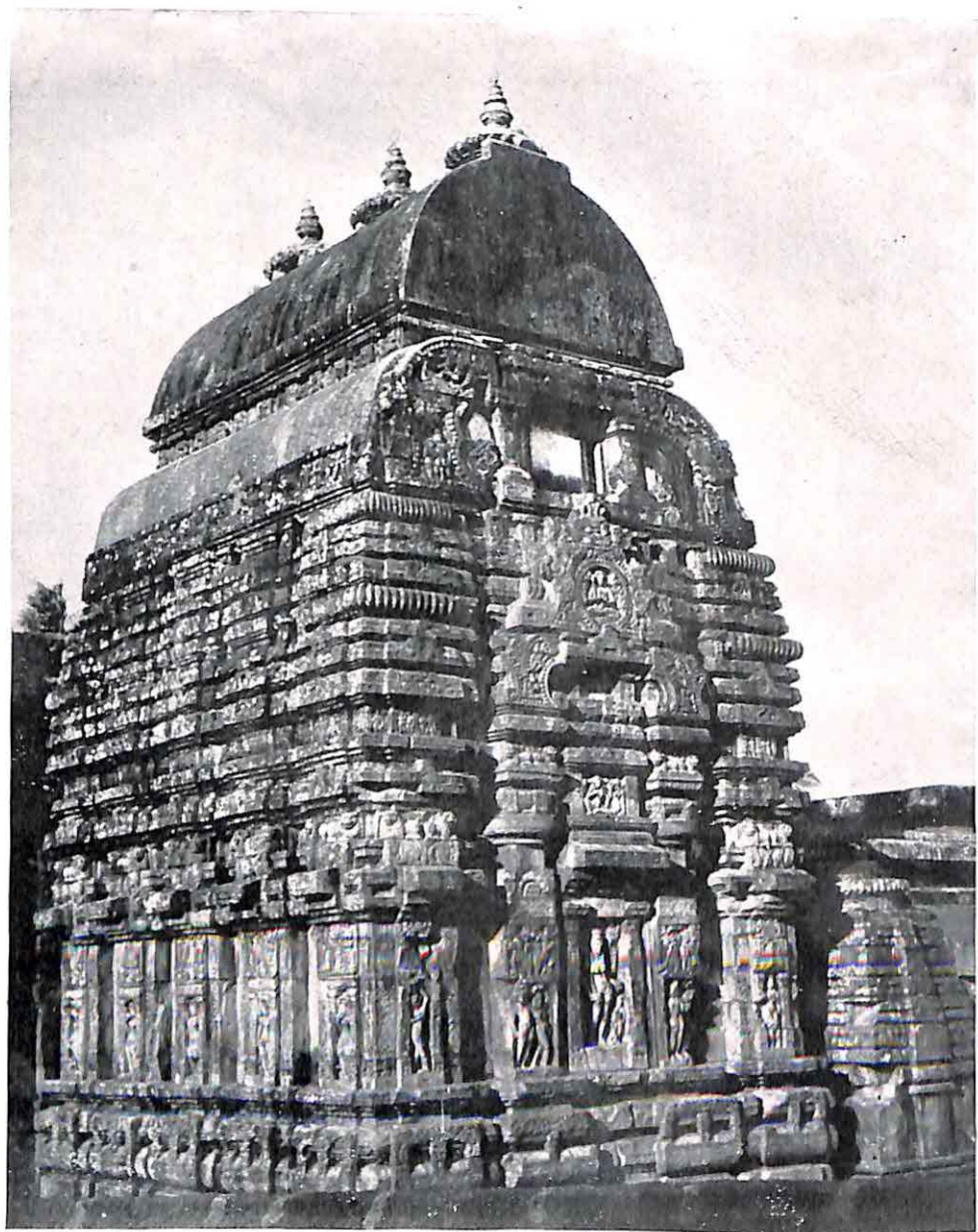
বৈতাল দেউল—ভুবনেশ্বর
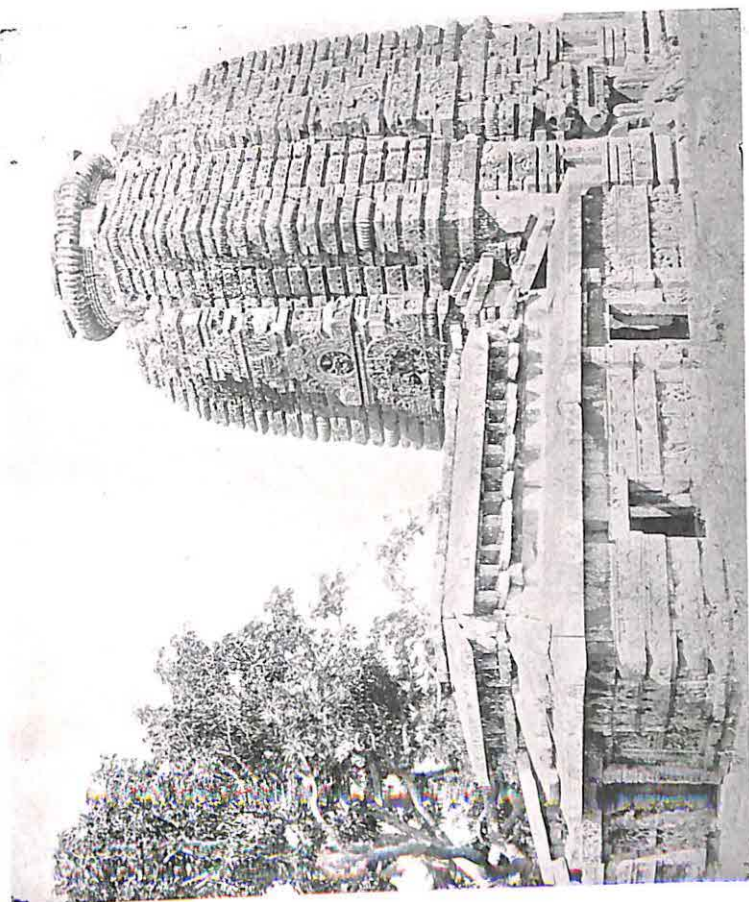
পরশুরামেশ্বর মন্দির—ভুবনেশ্বর
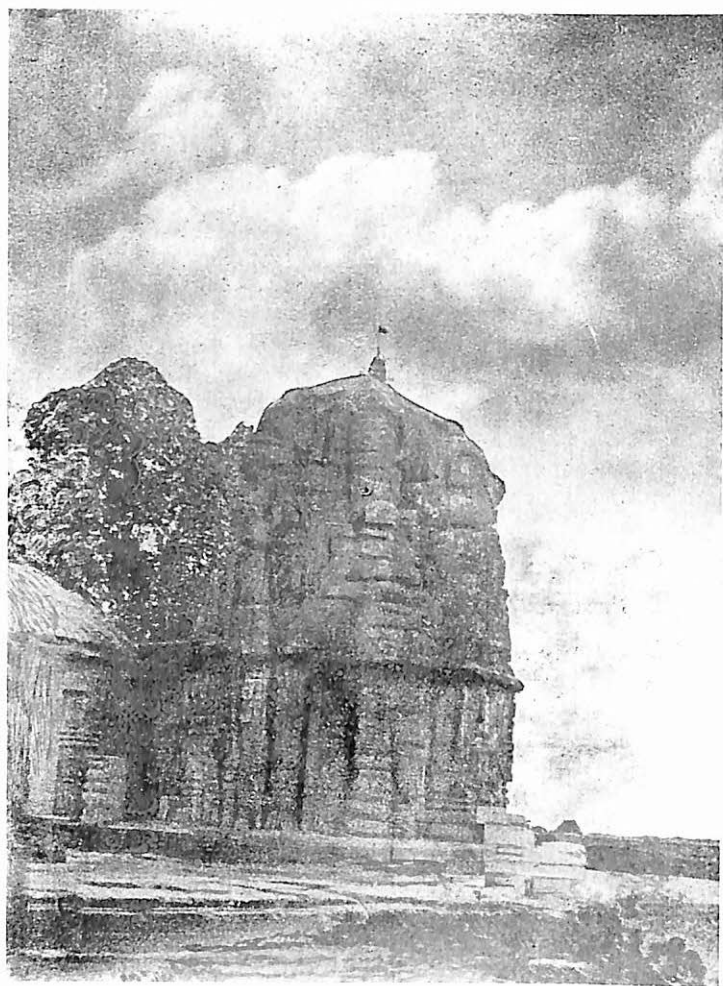
গৌরীর মন্দির—ভুবনেশ্বর

রাজারাণী মন্দির—ভুবনেশ্বর
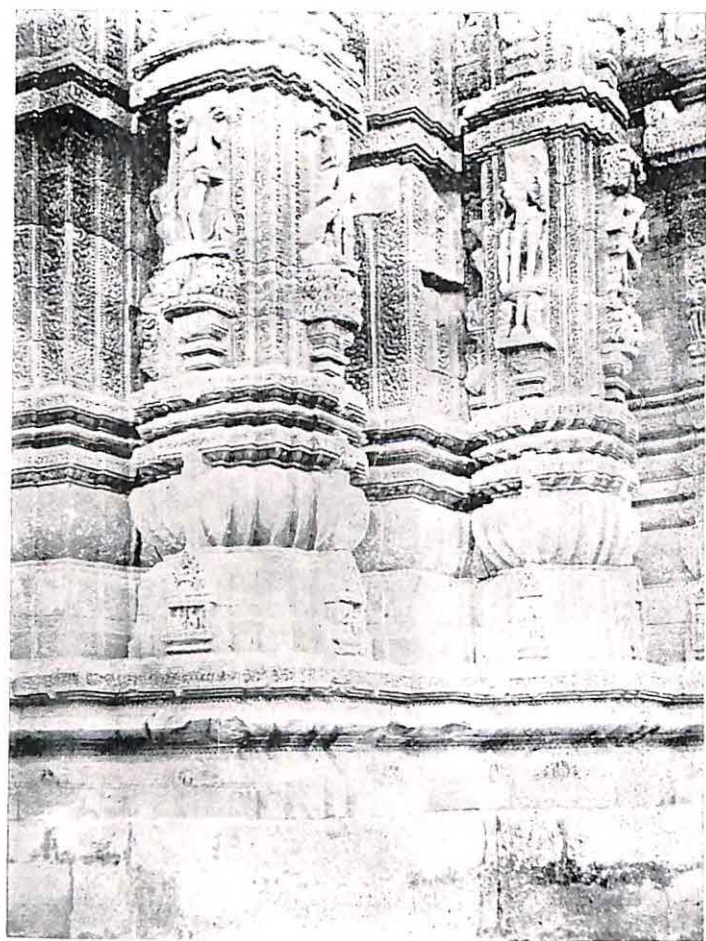
রাজারাণী মন্দিরের বহির্ভাগ—ভুবনেশ্বর
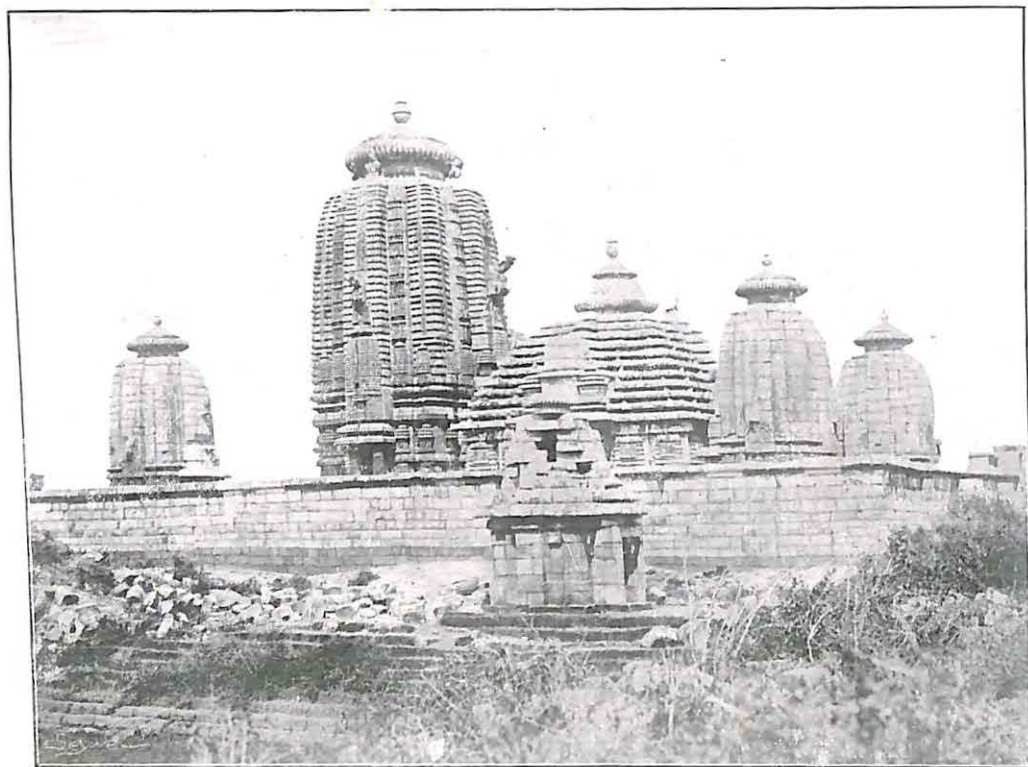
ব্রহ্মেশ্বর মন্দির—ভুবনেশ্বর

মুক্তেশ্বর মন্দিরের 'প্রসাধনরতা নায়িকা'—ভুবনেশ্বর

মুক্তেশ্বর মন্দিরের তোরণ—ভুবনেশ্বর
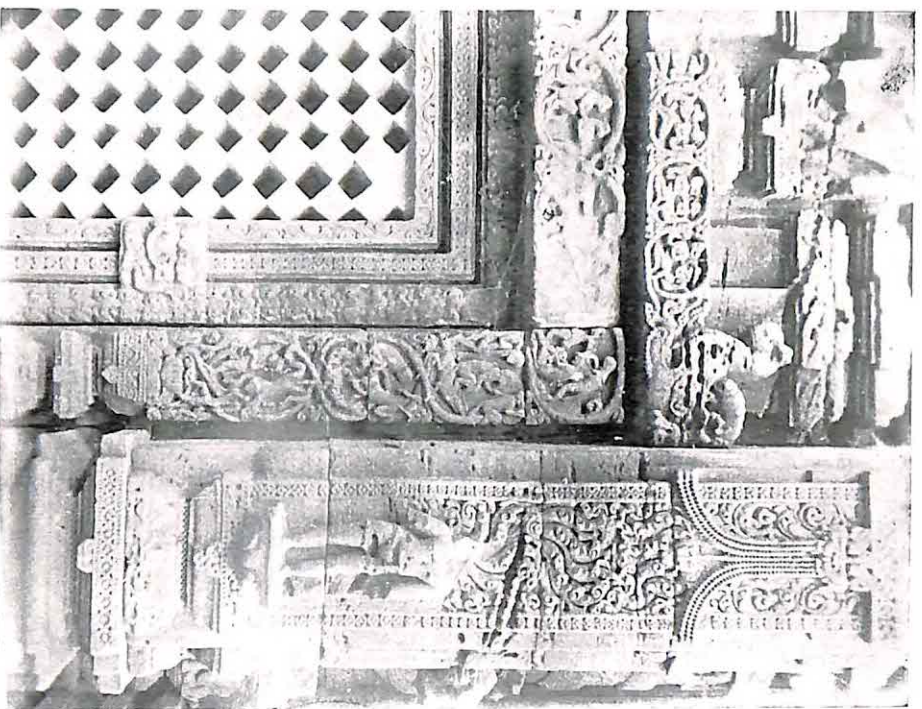
মুক্তেশ্বর মন্দিরের প্রস্তর শিল্পের নিদর্শন—ভুবনেশ্বর
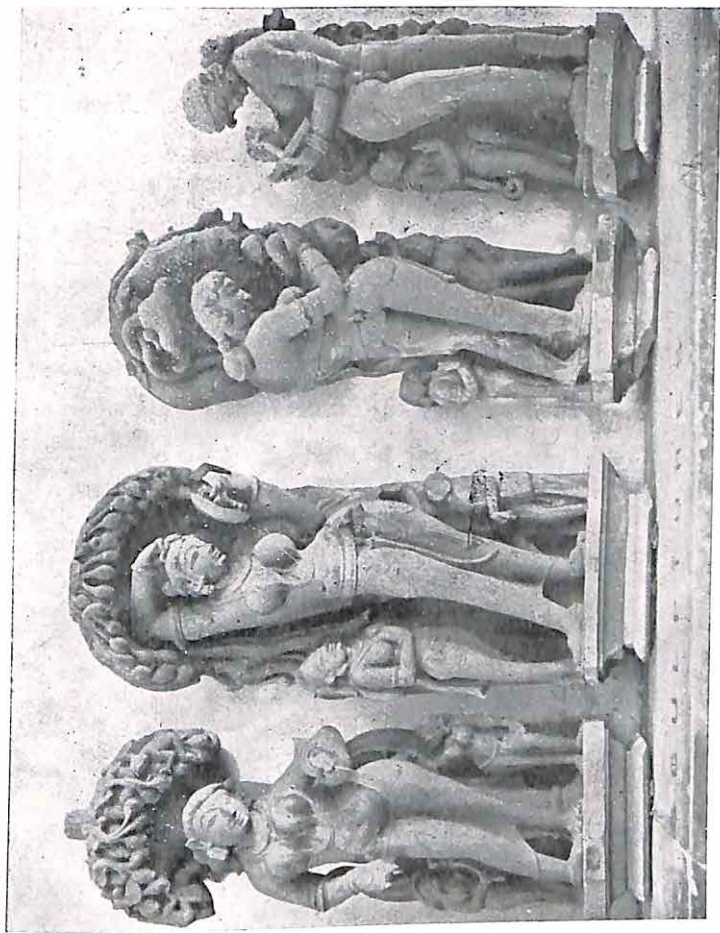
ভাস্কর্যের নিদর্শন—ভুবনেশ্বর

ভাস্করেশ্বর মন্দির—ভুবনেশ্বর
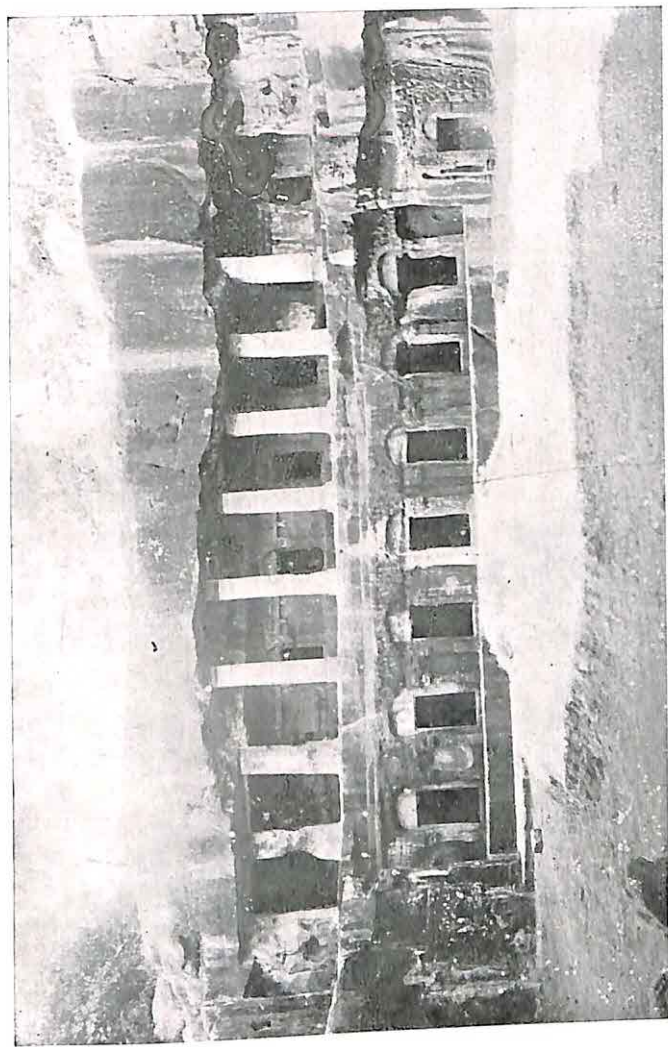
রাণীগুম্ফা—উদয়গিরি

খণ্ডগিরি গুহার নক্সা

অনন্তগুম্ফার প্রস্তর শিল্প

সূর্যমূর্তি—কণারক

সূর্য্যমন্দির—কণারক
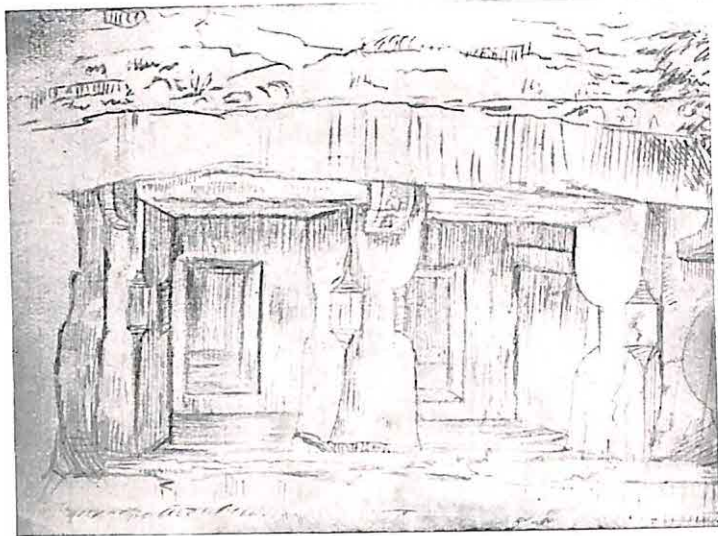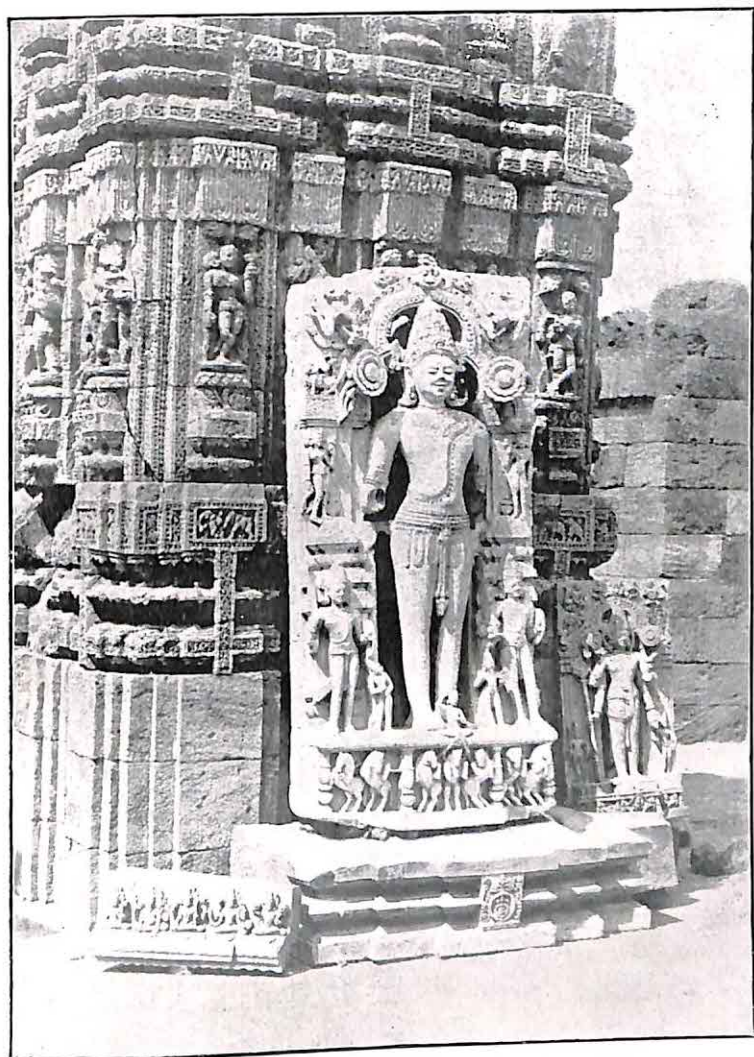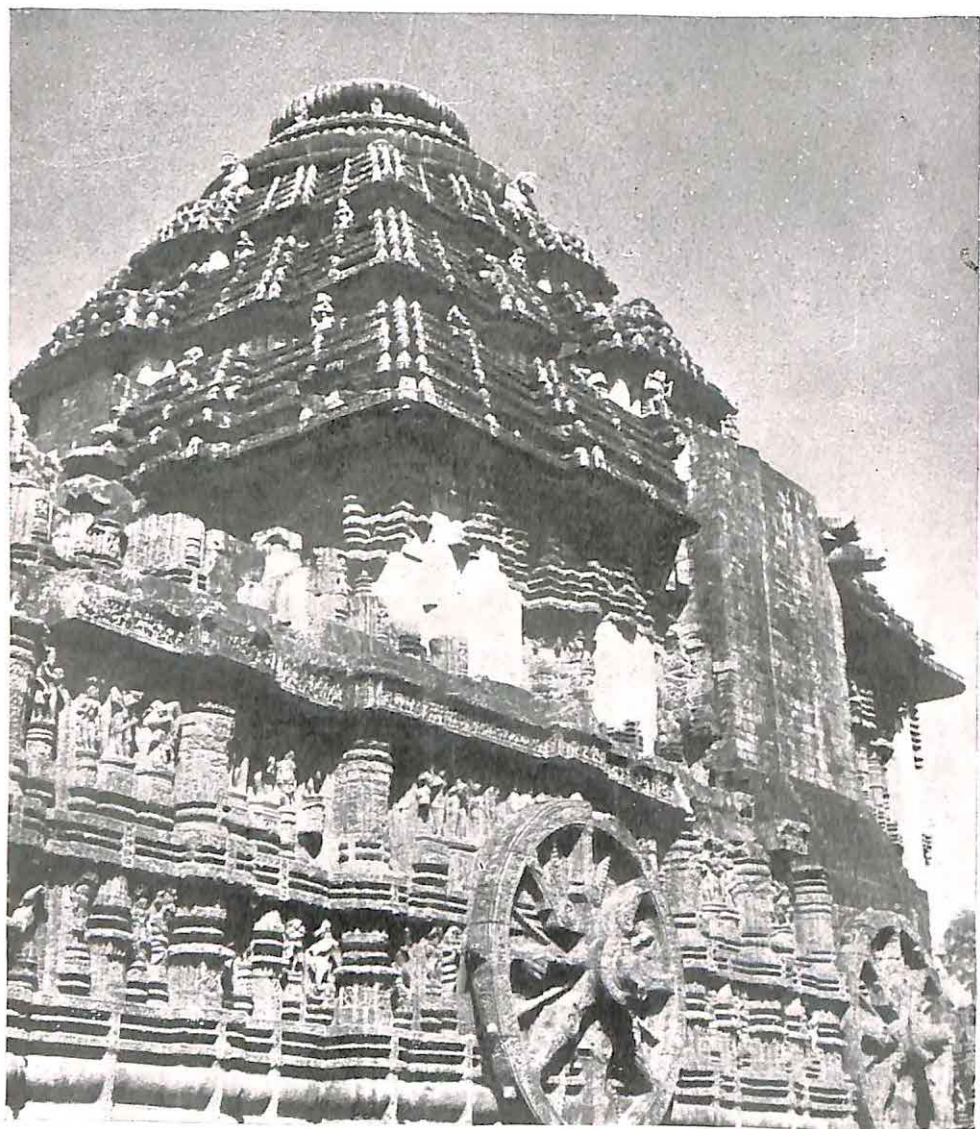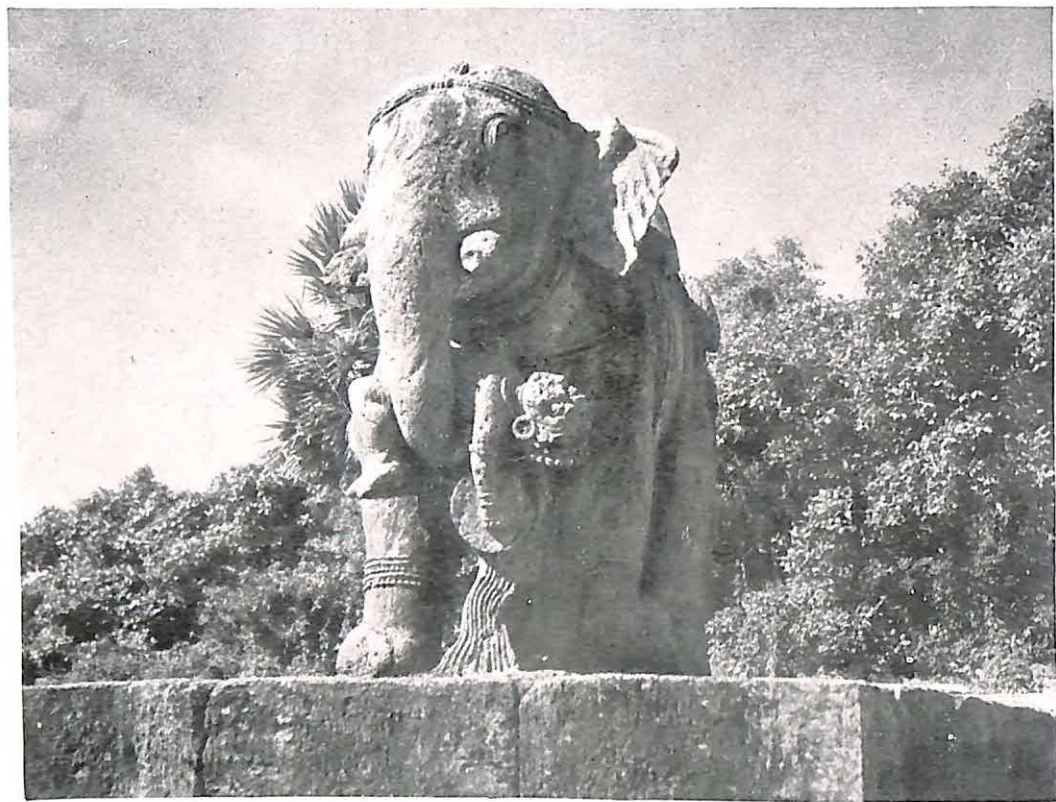
কণারকের বলদর্পী হস্তী
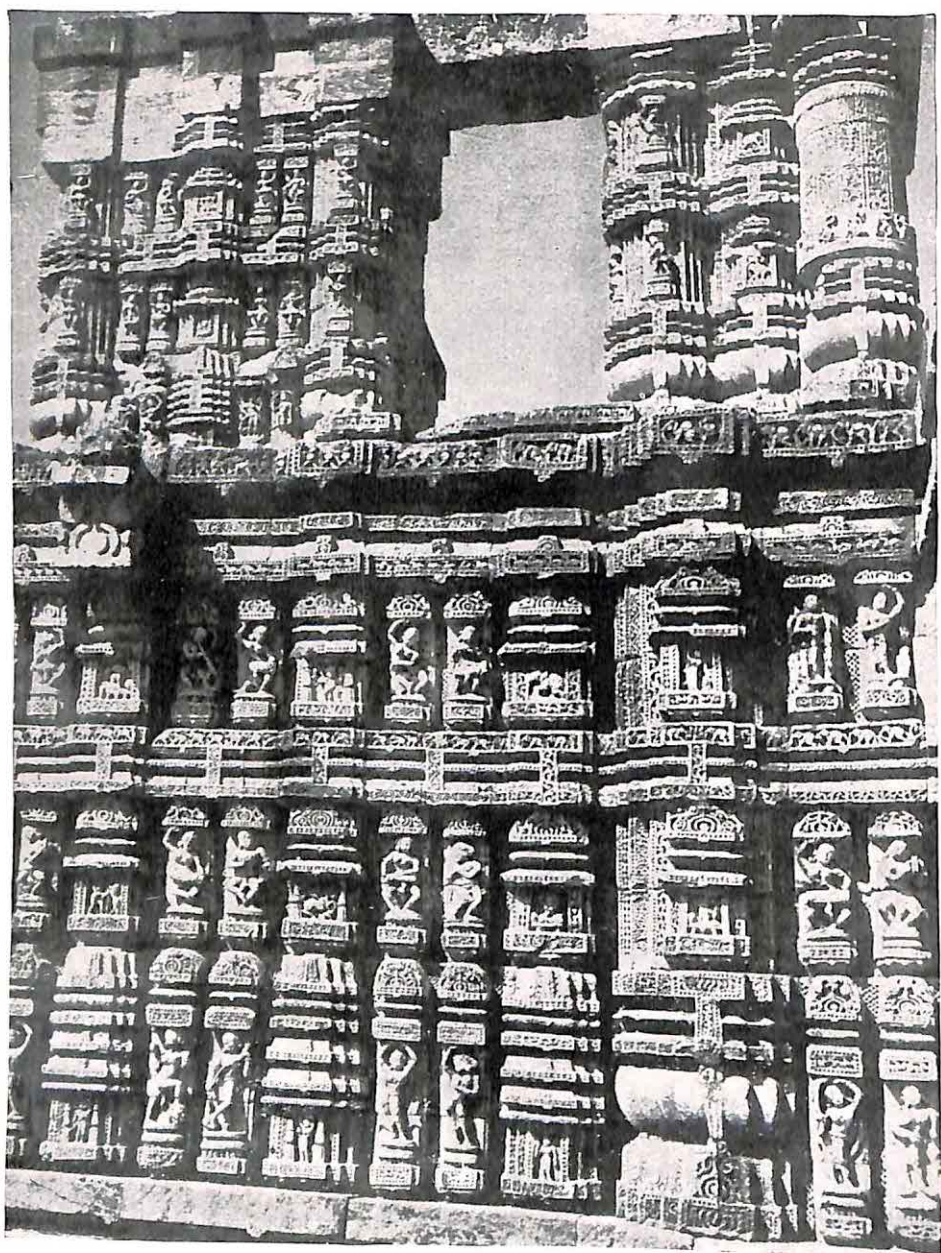
নাটমঞ্চ—কণারক

কণারকের ভোগমণ্ডপের ধ্বংশাবশেষ

কণারক সূর্যমন্দিরের রথের চাকা
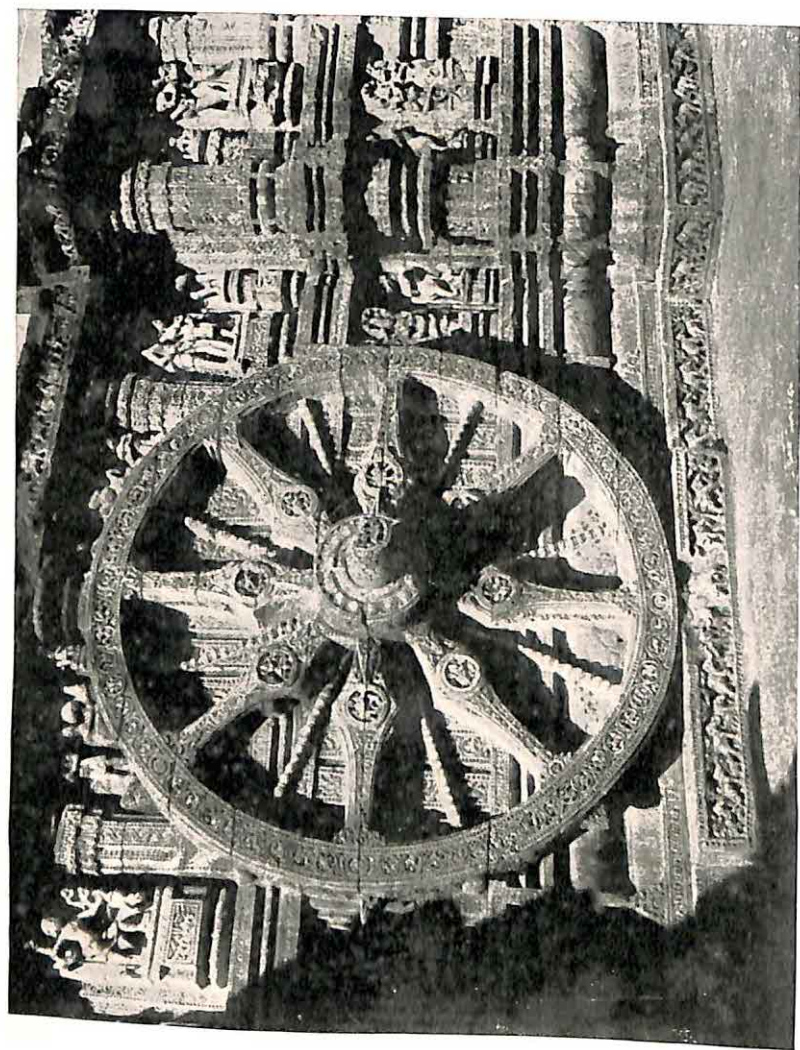
শ্রীক্ষেত্রের ইতিহাস

কয়েক বর্ষ পূর্বে নাইনটিনথ্ সেঞ্চুরী পত্রিকায় এনড্রু ল্যাং লিখিত কোন প্রবন্ধ পাঠ করিবার সময় দেখিলাম, কোন ইংরাজ প্রত্নতত্ত্ববিদ্ নাকি বলিয়াছেন যে, দেবভাষা সংস্কৃত, গ্রীক ভাষার আদর্শে ধূর্ত ব্রাহ্মণেরা রচনা করিয়াছেন এবং রামায়ণ, মহাভারত, গ্রীক কবি হোমারের ইলিয়াড ও অডিসির অনুকরণে রচিত। ভাবিলাম বাতুলতা ইহা অপেক্ষা ঊর্ধ্বে পৌঁছাইতে পারে না, কিন্তু হৃদয় আবেগক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল।

আমাদের সকলি গিয়াছে, আছে কেবল চিরস্মৃতি-বিজড়িত অতীতের সমাধি মন্দির। আমরা কোন্ প্রাচীন যুগের 'মমি' হইয়া আছি। এখনও যাহা আছে তাহাতে উদার পণ্ডিতেরা বিস্ময়াকুল নেত্রে নির্ণিমেষ দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন।

অতীত ভারতের 'শ্মশান' ক্ষেত্রে যে সমস্ত সমাধি মন্দির আপনার উন্নতশীর্ষ উত্তোলন করিয়া আছে তাহাদের মধ্যে অনেকগুলি রবিকিরণে উদ্ভাসিত, কতক বা ছায়াসুপ্ত। প্রাচীন উৎকল পূর্বোক্তের অন্তর্গত।

ভগবান্ বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের পূর্বেও উৎকল স্বীয় মহিমায় প্রকাশিত ছিল; শিল্প ও স্থাপত্যের বিকাশ হইয়াছিল। বৌদ্ধধর্মের মিলনে ইহার

আরও দিব্যশ্রী খুলিয়াছে। উৎকলে বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য ধর্ম দৃঢ়ালিঙ্গনাবদ্ধ।

মন্দির গাত্রে বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য মিলনোৎসব

কোন্ সুরভি সমাকুল প্রভাত-সমীর-সেবিত মুহূর্তে এই মহামিলন সংঘটিত হইয়াছিল তাহা নিশ্চিতরূপে অবধারণ করা যায় না; কিন্তু এই মিলন-সঞ্জাত স্মিতহাস্যে সমস্ত পুরাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতমণ্ডলী মুগ্ধ ও বিস্মিত। এ মিলনোৎসব পাষাণে চিরমুদ্রিত হইয়া নরনারীর মূর্তিরূপে বিদ্যমান। এ মিলনে উড়িষ্যার পাষাণও বুঝি সজীব হইল। যৌবনের এত কঠিন কোমল নিটোল পরিপূর্ণতা যে পাষাণে দেখাইতে পারা যায় তাহা কেহ জানিত না। শুধু যে যৌবন-বিলাস-কলার নৈপুণ্য প্রদর্শন করা হইয়াছে তাহা নহে, নারী মূর্তিতে মঞ্জুল যৌবনকুঞ্জ যে শুদ্ধ প্রসারিত রাখা হইয়াছে তাহা নহে, মাতৃমূর্তিরও পরিচয় আছে। এ দেবী কখন বা মাতৃরূপা শুচিস্মিতা, শান্তি-সমুজ্জলা, বিলাস-বিভ্রমহীনা শুদ্ধা অপাপবিদ্ধা ; কখন বা বিলাসলাবণ্যময়ী। কখন যৌবনে যোগিনী কখন বা কুসুমকুণ্ডলা। কখন বা দেবীর দৃষ্টি স্নেহ-ভারাবনতা, কখন বা দেবী শিথিলাঞ্চলা স্বপ্নালসা অতৃপ্ত-বেদনা-বিবশা। কখন ব্রীড়াবনতমুখী, কখন বা আবেগস্ফুরিতাধরা।

বলিয়াছি উৎকলে ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধধর্মের মিলন হইয়াছে। এই উৎকল ক্ষেত্রে এককালে 'বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, ধর্মং শরণং গচ্ছামি, সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি' স্বরে দিগন্ত পূর্ণ হইয়াছিল। এইখানেই অদ্বৈত কেশরীও গর্জন করিয়া বলিয়াছিলেন যে, 'ন তত্র সূর্যোভাতি ন চন্দ্র তারকং, নেমে বিদ্যুতো ভান্তি কুতো ইয়মগ্নিঃ'। এইখানে কতদিন পরে বৈষ্ণব

বৌদ্ধ-ব্রাহ্মণ্য-বৈষ্ণব মহাত্রিবেণী মিলন

ধর্মেরও অভ্যুদয় হইল! বৌদ্ধ, ব্রাহ্মণ্য ও বৈষ্ণব ধর্মের ত্রিধারা মিলিয়া উৎকলকে মহাত্রিবেণী তীর্থস্বরূপ করিল! জয়দেব আসিয়া শ্রীক্ষেত্রে বাস করিতে লাগিলেন। তিনি গাহিলেন—

'নিন্দসি যজ্ঞবিধেরহহ শ্রুতিজাতম্
সদয়হৃদয়দর্শিত-পশুঘাতম্
কেশবধৃত বুদ্ধশরীর, জয় জগদীশ হরে!'

গীতগোবিন্দ রত্ন বেদীর উপর স্থান পাইল। পরে শ্রীচৈতন্যদেব আসিয়া উৎকলের মহিমা আরও প্রকাশ করিলেন। এইখানে, এই দেবক্ষেত্রে বৈষ্ণবের পূর্বরাগ, অনুরাগ, মান, অভিমানের অভিনয় চলিতে লাগিল। এই পুরী মন্দিরেই জ্ঞান আসিয়া ভক্তির সহিত মিশিয়াছিল, আলোক আসিয়া ছায়ার সহিত মিলিত হইয়াছিল। এইখানে এই শ্রীমন্দিরে পণ্ডিত বাসুদেব সার্বভৌমের সহিত শ্রীচৈতন্যের মিলন হয়। এই উৎকলেই বৌদ্ধ পণ্ডিত রামগিরি শ্রীচৈতন্যের সহিত বিচারে পরাস্ত হইয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। এই নীলাচলে জয়দেবের কোমলকান্ত পদাবলী, বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের সরস কবিতা, শ্রীচৈতন্যের বিরাট প্রেমের উন্মেষে সহায়তা করিয়াছিল।

'চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি রায়ের নাটক গীতি
কর্ণামৃত শ্রীগীতগোবিন্দ।
স্বরূপ রামানন্দ সনে মহাপ্রভু রাত্রি দিনে
গায় শুনে পরম আনন্দ॥' (চৈতন্য চরিতামৃত)

উড়িষ্যা এক্ষণে প্রাচীন ধর্মবিপ্লব বা ধর্মসমন্বয়ের মহাসমাধি ক্ষেত্র।

ভারতের মধ্যে বারাণসী ও শ্রীক্ষেত্র এই দুই তীর্থই সর্বশ্রেষ্ঠ। বারাণসীতে নীচ জাতির দেবমন্দিরে গমনাধিকার নাই। জগন্নাথক্ষেত্রে নিম্নতম স্তরবাসী হিন্দু হইতে ব্রাহ্মণ পর্যন্ত সকল জাতির সমান অধিকার। জগন্নাথ ক্ষেত্র এখন জাতিভেদহীনতার প্রতীক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ব্রহ্মপুরাণ, স্কন্দপুরাণ,

নারদপুরাণ, পদ্মপুরাণ, ভবিষ্যপুরাণ—ইত্যাদিপুরাণে; স্মার্ত রঘুনন্দন কৃত পুরুষোত্তম ক্ষেত্রতত্ত্ব, পুরুষোত্তম পুরীমাহাত্ম্য ইত্যাদি সংস্কৃত গ্রন্থে; ক্ষেত্রপুরাণ, দারুব্রহ্ম, নীলাদ্রি মহোদয় প্রভৃতি উৎকল ভাষায় লিখিত গ্রন্থে এবং তৈলঙ্গ ভাষায় বেঙ্কটাচার্য লিখিত জগন্নাথ মাহাত্ম্য এবং বঙ্গকবি মুকুন্দরামকৃত জগন্নাথ মঙ্গল, পুরুষোত্তম চন্দ্রিকা প্রভৃতি গ্রন্থে শ্রীক্ষেত্রের মহিমা বর্ণিত হইয়াছে। বাস্তবিক কোন কোন হিসাবে বারাণসী অপেক্ষা শ্রীক্ষেত্র মহত্তর, ইহা সমগ্র মানবের মিলন স্থল; ইহা সমস্ত হিন্দু দেবদেবীর ক্রীড়াক্ষেত্র বা হিন্দু ধর্মের Pantheon। এমন সুন্দর সামঞ্জস্য বা একত্রীকরণ অন্য কোথায়ও দৃষ্ট হয় না।

বারাণসী ও শ্রীক্ষেত্র

জগন্নাথ ক্ষেত্রের অনেকগুলি নাম আছে—পুরুষোত্তম ক্ষেত্র, শ্রীক্ষেত্র, ক্ষেত্র। জগন্নাথ মন্দির নির্মাণ সম্বন্ধে পুরাণোপাখ্যান বা ইন্দ্রদ্যুম্ন বসুশবর, বিদ্যাপতি, ললিতা বা গাল মাধব উপাখ্যান সবিস্তারে আলোচনা করিয়া প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করিব না। সংক্ষেপে বলা যাইতেছেঃ

ভগবান্ বিষ্ণু নীলগিরি পর্বতে নীলমাধব রূপে বিরাজ করিতে ছিলেন; বসুশবর গভীর অরণ্যে গোপনে তাঁহার পূজার্চনা করিতেন। বসুশবরের পিতা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে শর নিক্ষেপে বধ করেন। বিদ্যাপতি নামক কোন ব্রাহ্মণ মালবরাজ ইন্দ্রদ্যুম্নের আদেশে নীলমাধবের অন্বেষণে পূর্বদেশে গমন করিয়া এই শবরের অতিথি হন। প্রজাপতির নির্বন্ধে শবর দুহিতা ললিতার সহিত বিদ্যাপতির শুভবিবাহ সংঘটিত হইল। ললিতার নিকট বিদ্যাপতি জানিলেন যে শবর নীলমাধবের পূজা করেন। ললিতার কৌশলে নীলমাধব দর্শন করিয়া তিনি ইন্দ্রদ্যুম্নের নিকট প্রস্থান করিলেন।

ইন্দ্রদ্যুম্ন আসিয়া দেখেন, নীলমাধব অন্তর্হিত হইয়াছেন। তখন দৈববাণী

হইল অগ্রে নীলমাধবের মন্দির নির্মাণ করিয়া ব্রহ্মার দ্বারা সেই মন্দিরের প্রতিষ্ঠা করা হইলে তবে তাঁহার দর্শন ঘটিবে। বকুলমালা পর্বত হইতে কূর্মপৃষ্ঠে প্রস্তর আনয়ন করাইয়া মন্দির নির্মিত হইল। রাজা ব্রহ্মার নিকট যাইলেন। তখন পিতামহ ব্রহ্মা সন্ধ্যাতর্পনাদি করিতেছিলেন বলিয়া ইন্দ্রদ্যুম্নকে অপেক্ষা করিতে বলিলেন। অপেক্ষা করিতে করিতে কত যুগ অতিবাহিত হইয়া গেল। ইতিমধ্যে জলপ্লাবন হইয়া মন্দির বালুকামধ্যে নিহিত হইল। এদিকে উৎকলের রাজসিংহাসনে কত রাজা গত হইল।

পরে কোন সময়ে উৎকলরাজ মাধব অশ্বারোহণে যাইবার সময় অশ্বক্ষুরে মন্দিরশীর্ষস্থ চূড়া বা নীলচক্র বিদ্ধ হইয়া এক শব্দ হইল। রাজা কারণ অন্বেষণ করিতে গিয়া খনন করাইতে লাগিলেন। খনন করাইতে করাইতে সমস্ত মন্দির বাহির হইয়া পড়িল। এদিকে ইন্দ্রদ্যুম্ন ব্রহ্মার তপস্যা শেষ হইলে তাঁহার সহিত আসিয়া দেখেন যে মাধবের অনুচরেরা মন্দির রক্ষা করিতেছে, তাঁহাদিগকে প্রবেশ করিতে দিল না। ক্রমে মাধব ও ইন্দ্রদ্যুম্নের মহা কলহ উপস্থিত হইল। ব্রহ্মা মধ্যস্থ হইয়া কল্পবটবৃক্ষবাসী 'ভূষণ্ডীকাকের' ও প্রস্তরবাহী কূর্মগণের সাক্ষ্যে সাব্যস্ত করিলেন যে ইন্দ্রদ্যুম্নই মন্দিরের প্রকৃত নির্মাতা। ব্রহ্মা মিথ্যাবাদী বলিয়া মাধবকে শাপ প্রদান করিলেন। ইহাতে তিনি 'গালমাধব' আখ্যা প্রাপ্ত হইলেন। তৎপরে ব্রহ্মা মন্দির প্রতিষ্ঠা করিলেন।

নীলমাধব আপন প্রতিজ্ঞানুযায়ী ইন্দ্রদ্যুম্নকে রাত্রিকালে দেখা দিলেন এবং বলিলেন যে, সমুদ্রতীরে যাইলে দারুব্রহ্মরূপে তাঁহার দর্শন পাইবেন। ইন্দ্রদ্যুম্ন যাইয়া দর্শন করিলেন এবং বসুশবরের সাহায্যে দারুকে রথে স্থাপিত করিয়া শ্রীক্ষেত্রে আনয়ন করিলেন। শ্রীমন্দিরের সম্মুখস্থ অরুণ স্তম্ভ বা গরুড় স্তম্ভের নিকট দারু স্থাপনা করা হইল।

ভগবান নারায়ণ স্বয়ং বৃদ্ধ সূত্রধররূপে দারু হইতে মূর্তি প্রস্তুত করেন।

সূত্রধরের অনুরোধ অনুসারে তাহাকে মন্দির মধ্যে দ্বাররুদ্ধ করিয়া জগন্নাথদেবের মূর্তি নির্মাণ করিতে আদেশ দেওয়া হইল। রাজার সহিত কথা ছিল যে একবিংশ দিন কেহ মন্দিরের দ্বার মোচন করিবে না।

ইন্দ্রদ্যুম্ন, মহিষী গুণ্ডিচার আগ্রহাতিশয্য লঙ্ঘন করিতে না পারিয়া পঞ্চদশ দিবসেই মন্দিরের দ্বারোন্মোচন করিতে আদেশ দিলেন। দ্বার উদ্ঘাটিত হইলে দেখা গেল মন্দিরমধ্যে কেহ নাই। সূত্রধরবেশী নারায়ণ অন্তর্হিত হইয়াছেন। রাজা দেখিলেন যে হস্তপদবিহীন অপূর্ণ দারুব্রহ্ম বা জগন্নাথ মূর্তি বিরাজিত রহিয়াছেন। কবি মাগুনিয়া দাস লিখিয়াছেন ঃ

'দেখিলে সিংহাসনোপরে।
বিজয়ে বউদ্ধ রূপরে॥
পদ অঙ্গুলি নাহি হাত।
শ্রীদারুব্রহ্ম জগন্নাথ॥'

রাজা বিশেষ শোক করিতে লাগিলেন যে স্বয়ং নারায়ণ তাঁহাকে ছলনা করিয়াছেন। রাত্রিকালে জগন্নাথদেব রাজাকে দর্শন দিয়া বলিলেন ঃ

'মুই বউদ্ধ রূপ হই।
কলিযুগরে থিবু রহি॥
সুবর্ণ হাত গোড় করি,
গড়াহি দেব দণ্ডধারি।' (মাগুনিয়া দাস)

অর্থাৎ কলিযুগে আমি হস্তপদহীন বুদ্ধ রূপে এখানে রহিব। তুমি সুবর্ণ দ্বারা আমার হাত গড়াইয়া দাও। রাজা কৃতাঞ্জলি হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—কে আপনার পূজা করিবেন ? নারায়ণ বলিলেন,—যে শবর বনে আমার পূজা

করিত তাহার পুত্র পশুপালক দইতাপতি আমার সেবা করিবে। বলভদ্র গোত্রীয় 'সুয়ারগণক শবরেরা আমার রন্ধন কার্যে নিযুক্ত হইবে। আমার প্রসাদ সকল জাতিই জাতিভেদ ভুলিয়া একত্র বসিয়া আহার করিবে' (বিশ্বকোষ, জগন্নাথ, পৃষ্ঠা ৫৭২)। আধুনিক সময়েও এই নিয়মেই পূজা ব্যাপার নিষ্পন্ন হইয়া থাকে।

মাদলা পাঁজীর মতে এই ঘটনার কিয়ৎকাল পরে রাজা শিবদেব বা শোভনদেবের রাজত্বকালে রক্তবাহু নামক জনৈক যবন সসৈন্যে অর্ণবপোতারোহণে আসিয়া পুরী আক্রমণ করেন। রাজা জগন্নাথমূর্তি ও মন্দিরান্তর্গত সমস্ত ঐশ্বর্য্য লইয়া উড়িষ্যার পশ্চিম প্রান্তবর্তী শোনপুর গোপালী নামক স্থানে পলায়ন করেন। জগন্নাথদেবের মূর্তি মৃত্তিকানিম্নে প্রোথিত করিয়া তদুপরি এক বটবৃক্ষ রোপণ করিয়া দিলেন। রক্তবাহু উড়িষ্যার রাজা হইয়া কিছুকাল রাজত্ব করেন। পুনরায় জলপ্লাবন হইয়া জগন্নাথমন্দির বালুকা স্তূপে প্রোথিত হয়।

ইহাই জগন্নাথদেবের মন্দিরনির্মাণ সম্বন্ধে উৎকল ও তৈলঙ্গ ভাষায় লিখিত ইতিহাসের সারমর্ম।

বুদ্ধদন্ত সম্পর্কিত আপ্তকথা

এক্ষণে আমরা এ সম্বন্ধে বৌদ্ধ ইতিহাসের সামান্য আলোচনা করিব। সিংহল দ্বীপে ভগবান বুদ্ধদেবের দন্তের ইতিহাস লইয়া অনেকগুলি গ্রন্থ প্রাপ্ত হওয়া যায়। তন্মধ্যে 'দাথধাতুবংশ' বা 'দাথবংশ' একখানি প্রামাণ্য গ্রন্থ। এখানি খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে রচিত হয়। ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র 'এন্টিকুইটি অব উড়িষ্যা' নামক পুস্তকে দাথবংশ হইতে সারোদ্ধার করিয়া দিয়াছেন। তাহাতে লিখিত আছে যে, ভগবান বুদ্ধদেবের নির্বাণের পর তাঁহার প্রজ্বলিত চিতা হইতে ক্ষেম নামক তদীয় শিষ্য দন্ত গ্রহণ

পূর্বক কলিঙ্গাধিপতি ব্রহ্মদত্তকে প্রদান করেন। ব্রহ্মদত্ত সেই দন্ত দন্তপুর নামক আপন রাজধানীতে প্রতিষ্ঠা করেন। ইহা হইতেই কলিঙ্গে বা উড়িষ্যায় বৌদ্ধ-ধর্ম প্রবেশ করে। তৃতীয় শতাব্দীতে গুহাশিব নামক রাজা ব্রাহ্মণ্যধর্ম ত্যাগ করিয়া বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন। দন্তাধিকার লইয়া পাটলিপুত্ররাজ পাণ্ডুর সহিত তাঁহার বিরোধ হয়। গুহাশিব বশ্যতা স্বীকার করেন এবং দন্ত লইয়া পাটলিপুত্রে আগমন করেন। পাণ্ডু ঐ দন্তের প্রতিষ্ঠার জন্য এক প্রকাণ্ড মন্দির নির্মাণ করাইয়া দেন। অবশেষে স্বস্তিপুররাজ ঐ দন্তের জন্য পাটলি-পুত্র আক্রমণ করিয়া পাণ্ডুকে নিহত করেন।

এদিকে গুহাশিব দন্ত লইয়া পলায়ন করেন ও দন্তপুরে ইহার পুনঃ প্রতিষ্ঠা করেন। স্বস্তিপুররাজের মৃত্যুর পর তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রেরা দন্তপুর আক্রমণ করেন। যুদ্ধে গুহাশিব প্রাণত্যাগ করেন, তাঁহার জামাতা মালবরাজ দন্তকুমার নদীতীরে দন্তটিকে বালুকার মধ্যে প্রোথিত করিয়া রাখেন; পরে গোপনে দন্তটি বাহির করিয়া লইয়া স্ত্রী হেমমালার সহিত তাম্রলিপ্তের বন্দরে অর্ণবপোতারোহনপূর্বক সিংহলে পলায়ন করেন। ডাঃ মিত্র ভিন্ন সকলেই দন্তপুরকে পুরী বলিয়া অনুমান করেন। দন্তটিকে বালুকার মধ্যে প্রোথিত করার সহিত জগন্নাথদেবের মূর্তিকে মৃত্তিকামধ্যে নিহিত করার যেন সম্বন্ধ রহিয়াছে বলিয়া বোধ হয়। সে কথার আলোচনা আমরা পরে করিব।

আধুনিক ইতিহাস ও শিলালিপি হইতে আমরা যাহা প্রাপ্ত হইয়া থাকি তাহার আলোচনা করা যাউক। রাজেন্দ্রলাল মিত্র, স্টার্লিং, হান্টার প্রভৃতি পণ্ডিতেরা সকলেই বলেন যে, কেশরীবংশের স্থাপয়িতা যযাতিকেশরী ৪৭৩ অব্দে উড়িষ্যার সিংহাসনে অধিরোহন করেন। যাযপুরে তিনি প্রথম রাজধানী স্থাপন করেন। কথিত আছে উৎকলদেশ কোন সময় ১৪৬ বৎসর ধরিয়া যবনাধিকারে ছিল। তিনি যবনদিগকে বিদূরিত করিয়া ব্রাহ্মণ্য ধর্মের

শিলালিপির মত ও আধুনিক ইতিহাসে

প্রাধান্য পুনঃ স্থাপিত করিলেন। পূর্বে যে রক্তবাহুর কথা বলা গিয়াছে এই যবনেরা বোধহয় তাঁহারই অনুচর ও বংশধর।

জনমেজয় পুত্র যযাতি কেশরীর আবির্ভাব কাল লইয়া অনেক মতভেদ আছে; আমরা সে সব তর্কযুদ্ধে প্রবেশ করিব না। আধুনিক প্রত্নতত্ত্ববিদেরা বলেন যে, যযাতির আবির্ভাব কাল খৃষ্টীয় নবম শতাব্দী। বিশ্বকোষে নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় এই কথা লিখিয়াছেন। ১৩০৯ বর্ষের বঙ্গদর্শনে 'যযাতিকেশরী' প্রবন্ধে বিজয়চন্দ্র মজুমদার মহাশয় নবম শতাব্দী বলিয়া প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। এই যযাতিকেশরী জগন্নাথের মন্দিরের প্রাধান্য স্থাপন করেন। বৌদ্ধধর্মে যেমন 'দেবানাং প্রিয় প্রিয়দর্শী' মহারাজ অশোক, তেমনি ব্রাহ্মণ্য ধর্মে রাজা যযাতিকেশরী। ইনিই ভুবনেশ্বরের প্রতিষ্ঠা করেন। যযাতি নিজে শৈব ছিলেন, কিন্তু সকল সম্প্রদায়েরই সম্মান করিতেন। জগন্নাথ মন্দিরের সংস্কারই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। উড়িষ্যা ভিন্ন এমন সর্ব-ব্যাপী সামঞ্জস্য ভারতের আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না।

স্টার্লিং সাহেব বলেন যে যযাতির পূর্বেও মন্দির বিদ্যমান ছিল; আমারও সেই বিশ্বাস। পুরাতন-শ্রেণীর প্রত্নতত্ত্ববিৎ পন্ডিতের মতে অর্থাৎ ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র ইত্যাদির মতে, প্রায় ৬ শত বৎসর রাজত্ব করিয়া ১১৩১ অব্দে কেশরী বংশের অবসান হয়।

কেশরীবংশের পর গঙ্গবংশের রাজারা উৎকলের সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইঁহারা বৈষ্ণব ছিলেন। রাজা অনিয়ঙ্ক ভীমদেবের (বা অনঙ্গ দেবের) সময় গঙ্গবংশের বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল। অনিয়ঙ্কদেবের রাজ্যের সীমা—উত্তরে ত্রিবেণী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল, রাজ্যের পরিমাণ—৩৯৪০৭ বর্গমাইল (তিনি আপন রাজ্য জরীপ করেন)। তাঁহার রাজস্ব ৩৫ লক্ষ স্বর্ণমার বা

গঙ্গবংশ

আধুনিক ২ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা। তাঁহার রাজকোষে নগদ ৩ কোটি ২০ লক্ষ টাকা ও মণিমুক্তায় ৫০ লক্ষ টাকা মজুত ছিল। (শ্রীদারুব্রহ্ম পৃঃ ৫৮)

অনিয়ঙ্ক ভীমদেব ১১৭৪ অব্দে রাজসিংহাসনে আরোহণ করেন এবং ১১৯৮ অব্দে অর্থাৎ দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে পরমহংস বাজপাই নামক জনৈক অমাত্যের তত্ত্বাবধানে শ্রীমন্দির পুনর্নির্মাণ করেন। ইহাতে তাঁহার ১ কোটি টাকা ও ১৭ লক্ষ টাকা মূল্যের মণিমুক্তা ব্যয়িত হয়।

অনিয়ঙ্ক ভীমদেবের পূর্বে জগন্নাথদেবের প্রতিপত্তি যে বহুদূরে ব্যাপ্ত হইয়াছিল তাহার প্রমাণ এই যে অনিয়ঙ্কের রাজ্য-সময়ে গীতগোবিন্দ-রচয়িতা কবি জয়দেব জগন্নাথ ক্ষেত্রে গমন করেন। গীতগোবিন্দের একখানি প্রাচীন পুঁথির শেষে লিখিত আছে যে, 'অথ লক্ষণ সেন নাম নৃপতিসময়ে শ্রীজয়দেবস্য কবিরাজপ্রতিষ্ঠা'। লক্ষণ সেন অনিয়ঙ্কের সম-সাময়িক, কেন না ইনিও অনিয়ঙ্কের ন্যায় দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে রাজত্ব করিতেন।

উড়িষ্যার স্থাপত্য

এক্ষণে পুরীর মন্দিরের স্থাপত্য সম্বন্ধে কিছু বলিবার পূর্বে সে সময়কার উড়িষ্যাব স্থাপত্য সম্বন্ধে স্থূলভাবে কিছু বলা কর্তব্য।

ললিতকলা সমালোচক ইংরাজ পণ্ডিত রাস্কিন স্থাপত্যের ৫টি শ্রেণী বিভাগ করিয়াছেনঃ ১। ধর্মমূলক, ২। স্মৃতিমূলক বা স্মারক, ৩। রাষ্ট্রমূলক, ৪। সমরমূলক, ৫। সাধারণ।

ভারতবর্ষীয় উদাহরণ দ্বারা আমরা শ্রেণীবিভাগ বুঝিতে চেষ্টা করিব। ১। **ধর্মমূলক**—যেমন পুরী বা ভুবনেশ্বরের মন্দির। ২। **স্মৃতিমূলক**—যেমন সারনাথের স্তূপ, তাজমহল, ইতিমাৎদ্দৌলা ইত্যাদি। ৩। **রাষ্ট্রমূলক**—যেমন দেওয়ানি খাস, দেওয়ানি আম ইত্যাদি। ৪। **সমরমূলক**—যেমন ভরতপুরের দুর্গ, দিল্লীর দুর্গ, চুনারের দুর্গ। ৫। **সাধারণ**—যেমন শিস্‌মহল অথবা সাধারণের অট্টালিকা।

পূর্বোক্ত ৫টি শ্রেণী-বিভাগের মধ্যে ধর্মমূলক স্থাপত্যের জীবনীশক্তি সর্বাপেক্ষা অধিক। তন্নিম্নে স্মৃতিমূলক। ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ উড়িষ্যায়। উড়িষ্যায় এক্ষণে প্রাচীন ধর্মমূলক স্থাপত্য বিদ্যমান। দুই একটি স্মৃতি-মূলক স্থাপত্য ধর্মমূলক সাহচর্যহেতু এখনও জীবিত। ইহাতে ধর্মের

অজেয় মাহাত্ম্যই প্রকাশ পায়। প্রবল প্রতাপান্বিত কেশরী, গঙ্গ বা গজপতি বংশীয় নৃপতিদিগের প্রাসাদ, দুর্গ বা প্রাকারাদির চিহ্নও বিদ্যমান নাই; কিন্তু তাঁহারা ধর্মানুপ্রাণিত হইয়া যে সকল মন্দিরের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন তাহাদের মধ্যে অনেকগুলি এখনও আপনাদের উন্নতশীর্ষ মহিমশ্রীমণ্ডিত মস্তক উত্তোলন করিয়া আছে।

দাক্ষিণাত্যের স্থাপত্য

দাক্ষিণাত্যে নিম্নলিখিত তিন প্রকারের স্থাপত্য কৌশল দৃষ্ট হয়।

১। দ্রাবিড় (Dravidian), ২। চালুক্য (Chalukyan), ৩। আর্য (Indo Aryan)। উড়িষ্যা শেষোক্তের নিদর্শন স্থল। উপরোক্ত তিন প্রকার স্থাপত্যের বৈশিষ্ট্য সংক্ষেপে বলা যাইতেছে ঃ

দ্রাবিড়—গ্রাউন্ড প্ল্যান (Ground plan) আয়তাকার এবং বিমান পিরামিডের আকৃতির ন্যায়।

চালুক্য—গ্রাউণ্ড প্ল্যান নক্ষত্রাকৃতি এবং বিমান পিরামিড-এর ন্যায়।

আর্য—গ্রাউন্ড প্ল্যান চতুরস্রাকৃতি এবং বিমান বক্ররেখা বন্ধ বা (Curvilinear)।

স্থপতি বিদ্যা সম্বন্ধীয় পুস্তক

রামরাজ 'দি আর্কিটেকচার অব দি হিন্দুজ' নামে যে পুস্তক লিখিয়াছেন তাহাতে হিন্দুদিগের প্রাচীন স্থাপত্যের বিবরণ বিশেষভাবে বিবৃত আছে। তিনি স্থপতিবিদ্যা সম্বন্ধীয় অনেকগুলি প্রাচীন পুস্তকের নামোল্লেখ করিয়াছেন। যথা ঃ—কশ্যপ প্রণীত কাশ্যপ, মানসার, ময়মত, সারস্বত্যং, পঞ্চরত্নং, বিশ্বকর্মীয়, মনুষ্যালয় চন্দ্রিকা।

ইহা ব্যতীত বরাহমিহিরের বৃহৎসংহিতা গ্রন্থেও স্থাপত্যের বিধি লিখিত আছে।

উড়িষ্যার মন্দিরগুলির সাধারণতঃ দুইটি অঙ্গঃ ১। **বিমান** বা বড় দেউল—এখানে বিগ্রহ রক্ষিত হয়; ২। **জগমোহন** (audience chamber)—এখান হইতে বিগ্রহ দর্শন করা হয়। শ্রীক্ষেত্র, ভুবনেশ্বর প্রভৃতি প্রধান মন্দিরে, মন্দিরের আরও দুইটি অঙ্গ বিদ্যমান, **নাটমন্দির ও ভোগমন্দির**। নাটমন্দিরে দেবতার তৃপ্তির জন্য নৃত্য গীত বাদ্যাদি হইয়া থাকে এবং ভোগমন্দিরে বিগ্রহের উদ্দেশ্যে ভোগ রক্ষিত হয়।

বিমান নির্মাণ কৌশল

পূর্বোক্ত মানসার গ্রন্থে অষ্টাদশ হইতে একোনত্রিংশ অধ্যায় পর্যন্ত বিমান নির্মাণ কৌশল বিবৃত করা হইয়াছে। রামরাজ উদ্ধৃত ময়মতানুসারে বিমানগুলি আয়তন হিসাবে পাঁচ শ্রেণীতে বিভক্ত। ১। **শান্তিক** বা সাধারণ, ২। **পৌষ্টিক** বা স্থূলকার, ৩। **জয়দ** বা উচ্চ, ৪। **সর্বকাম**—উচ্চতর এবং লোকপ্রিয়, ৫। **অদ্ভুত**—উচ্চতম ও বিস্ময় প্রকাশক।

আর্যশিল্পে উড়িষ্যা ও ধারওয়ার

ভারতবর্ষের মধ্যে প্রাচীন আর্যশিল্পের নিদর্শনস্থল ধারওয়ার ও উড়িষ্যা। ধারওয়ার স্থাপত্যের সহিত দ্রাবিড় স্থাপত্যের মিশ্রণ হইয়াছে কিন্তু সমগ্র ভারতের মধ্যে শুদ্ধ উড়িষ্যায় অবিমিশ্র আর্য শিল্পের উদাহরণ দৃষ্ট হয়। উত্তর পশ্চিমাঞ্চল, বারাণসী, অযোধ্যা, মথুরা, বৃন্দাবন প্রভৃতি কোন স্থানেরই স্থাপত্য অমিশ্র নহে। এই হিসাবে উড়িষ্যার গৌরব সামান্য নহে। তথাপি হান্টার, ফার্গুসন প্রভৃতি পণ্ডিতেরা উড়িষ্যার শিল্পে গ্রীক স্থাপত্যের গন্ধ পাইয়া থাকেন। ইহা যে নিতান্ত অমূলক আমরা বুঝিতে চেষ্টা করিব।

উপকরণ হিসাবে বিমান তিন শ্রেণীতে বিভক্ত ঃ শুদ্ধ, মিশ্র এবং সংকীর্ণ।

বিমানের শ্রেণীবিভাগ

একমাত্র উপকরণ, যেমন প্রস্তর কিংবা ইষ্টক দ্বারা নির্মিত হইলে 'শুদ্ধ', একটির অধিক হইলে 'মিশ্র' এবং দুই-এর অধিক উপকরণে নির্মিত হইলে 'সংকীর্ণ' পদ বাচ্য। আকৃতি হিসাবে বিমান তিন শ্রেণীতে বিভক্ত ঃ—নাগর, দ্রাবিড় ও কোর। চতুরস্রাকৃতি হইলে **'নাগর'**, অষ্টকোণ হইলে **'দ্রাবিড়'** ও বৃত্তাকার হইলে **'কোর'**।

উড়িষ্যার অনেক মন্দিরে Plinth বা পোতা দৃষ্ট হয় না। ভুবনেশ্বরান্তর্গত মন্দিরে প্লিন্থ দেখা যায় নাই।

উড়িষ্যার বিমানগুলি প্রথমে চতুরস্রাকারে বা আয়তাকারে উঠিয়াছে। পরে কিছু উচ্চে উঠিয়া তথা হইতে বক্র বা ক্রমোচ্চ (Slant) ভাবে পিরামিড-এর ন্যায় দেউল উঠিয়াছে। খিলান বলিলে আমরা যাহা বুঝিয়া থাকি তাহা উড়িষ্যার শিল্পীরা জানিতেন না। চতুরস্রাকার গৃহভিত্তির চারিদিক হইতে সমতলভাবে বৃহৎ প্রস্তর খণ্ড ভিতর দিকে বাহির করিয়া দেওয়া হইত। এইরূপে ক্রমে ক্রমে মন্দির গৃহের ভিতরের আয়তনকে হ্রাস করিয়া দেওয়া হইত এবং সর্ব উপরে প্রস্তরখণ্ড দিয়া সমতল ছাদ করিয়া দেওয়া হইত। ভিতর হইতে ঊর্ধ্বে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে বোধহয়, ঠিক যেন সোপান শ্রেণী বিপর্যস্ত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। আধুনিক নব্য স্থপতি বিদ্যায় ইহাকে কর্বেলিং (Corbelling) বলে।

সর্বোচ্চ সমতল প্রস্তরটির উপর একখানি বর্তুলাকার প্রস্তর স্থাপিত; তাহার নাম আমলকশিলা। ইহা অনেকটা আমলকী ফলের ন্যায়। বৃহৎ মন্দিরে সর্বোচ্চ সমতল প্রস্তর ও আমলক শিলার মধ্যে অনেকটা ব্যবধান দৃষ্ট

আমলক শিলা

হয়; এই ব্যবধানস্থ প্রস্তর লম্বভাবে উঠে। এই দুই প্রস্তরের মধ্যস্থ কুলঙ্গ বা খাঁজের মধ্যে সিংহ

মূর্তি বা অন্য কোন পশুমূর্তি স্থাপিত হয়। বৃহৎ মন্দিরে আমলক শিলা এই পশুমূর্তির শিরোদেশে স্থাপিত থাকে।

আমলক শিলার উপর ছত্রাকার আর একখানি প্রস্তর ন্যস্ত হয়; এবং তদুপরি কলস প্রস্তর। কলস ঠিক ইংরাজী স্থাপত্যের ফিনিয়েল-এর (finial) ন্যায়। এই কলসপ্রস্তরের উপর চক্র কিংবা ত্রিশূল স্থাপিত।

উড়িষ্যার প্রধান মন্দিরগুলি প্রাচীর বেষ্টিত। কোন কোন মন্দিরে বহিঃ প্রাচীরের ভিতর আর একটি প্রাচীর থাকে; যেমন পুরীর মন্দির।

মন্দিরের দিক নির্ণয় হিন্দুদের নিকট এক একটি দিকের নির্দিষ্ট অধীশ্বর আছেন বলিয়া মন্দির নির্মাণের দিক নির্ণয় করা বিধেয়। রামরাজ তাঁহার পুস্তকে দিক নির্ণয় করিবার জন্য শঙ্কু বা Gnomon অঙ্কিত করিবার পদ্ধতি বিবৃত করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়ঃ—

শিলাতলেঽম্বু সংশুদ্ধে বজ্রলেপেঽপি বা সমে।
তত্র শঙ্কঙ্গুলৈরিষ্টৈঃ সমং মণ্ডলমালিখেৎ॥
তন্মধ্যে স্থাপয়েচ্ছঙ্কুং কল্পনা দ্বাদশাঙ্গুলম্।
তচ্ছায়াগ্রং স্পৃশেদ্ যত্র বৃত্তে পূর্বাপরার্ধয়োঃ॥
তত্র বিন্দুবিধায়োভৌ বৃত্তে পূর্বাপরাভিধৌ।
তন্মধ্যে তিমিনা রেখা কর্তব্যা দক্ষিণোত্তরা॥
যাম্যোত্তরদিশোর্মধ্যে তিমিনা পূর্ব-পশ্চিমা।
দিঙমধ্যমৎস্যৈঃ সংসাধ্যা বিদিশস্তদ্ বদেব হি॥
ইতি সূর্যসিদ্ধান্তে তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ত্রিপ্রশ্নাধিকারঃ।

এইখানে একটি কথা বলিয়া রাখি। হিন্দুরা উত্তর কিংবা পূর্বাস্য হইয়া সন্ধ্যাবন্দনাদি বা বিগ্রহাদির পূজার্চনা করিয়া থাকেন। উড়িষ্যার অধিকাংশ মন্দিরই পূর্বদ্বারী। তাহা হইলে পূজার সময় ব্রাহ্মণকে পশ্চিমাস্য হইয়া পূজা করিতে হয়। সমগ্র ভারতের মধ্যে ইহা অভিনব। পুরী, ভুবনেশ্বর, কণারক প্রভৃতি সমস্ত মন্দিরদ্বারই পূর্বদিকে।

উড়িষ্যার মন্দিরগুলি স্তম্ভবিহীন বা এ্যাস্টাইলর (Astylar)। এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়ঃ

প্রাসাদে মণ্ডপে বাপি শিখরং যদি কল্প্যতে।
স্তম্ভস্তত্র ন কর্তব্যা ভিত্তিস্তত্র সুখপ্রদা॥ ১৩৩ ॥
(শুক্রনীতিসারে চতুর্থাধ্যায়স্য চতুর্থ প্রকরণম্)

কিন্তু ভুবনেশ্বরে ভোগমণ্ডপ এবং জগমোহনে স্তম্ভ দৃষ্ট হয়। ইংরাজ প্রত্নতত্ত্ববিদেরা ইহা হইতে অনুমান করেন যে ভোগ মণ্ডপ অনেক পরে নির্মিত হইয়াছে এবং জগমোহনের স্তম্ভগুলি পরে যোগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। আমার কিন্তু এ প্রমাণে তত আস্থা হয় না। কেননা উড়িষ্যার আরও দক্ষিণের মন্দির সমূহে বিচিত্র কারুকার্য খচিত স্তম্ভ বিদ্যমান; উড়িষ্যার মন্দিরে যে প্রাচীন কালে স্তম্ভ ছিল না ইহা বোধের অতীত। আর এক কথা, রামরাজ তাঁহার পুস্তকে স্তম্ভ নির্মাণ সম্বন্ধে শ্রেণী বিভাগ, কৌশল ইত্যাদি বিবৃত করিয়াছেন।

মন্দিরের বহিঃ প্রাচীরের চারিধারে চারিটি তোরণ নির্মিত হয় এবং বৃহত্তমটি বা সিংহদ্বার পূর্বদিকে স্থাপিত হয়। উড়িষ্যার মন্দিরের আর একটি বিশেষত্ব এই যে তোরণের উপরে একখানি সমগ্র (entire) প্রস্তরের উপর (রবি, চন্দ্র, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, রাহু কেতু,) নবগ্রহের মূর্তি খোদিত থাকে।

Rough SKETCH SHOWING THE HALF OF REKHA DEWL

By M. M. Ganguly

। পঞ্চরথ দেউলের ভূমিনক্সা

উড়িষ্যার প্রস্তরশিল্পে "পত্রলতা"র নমুনা
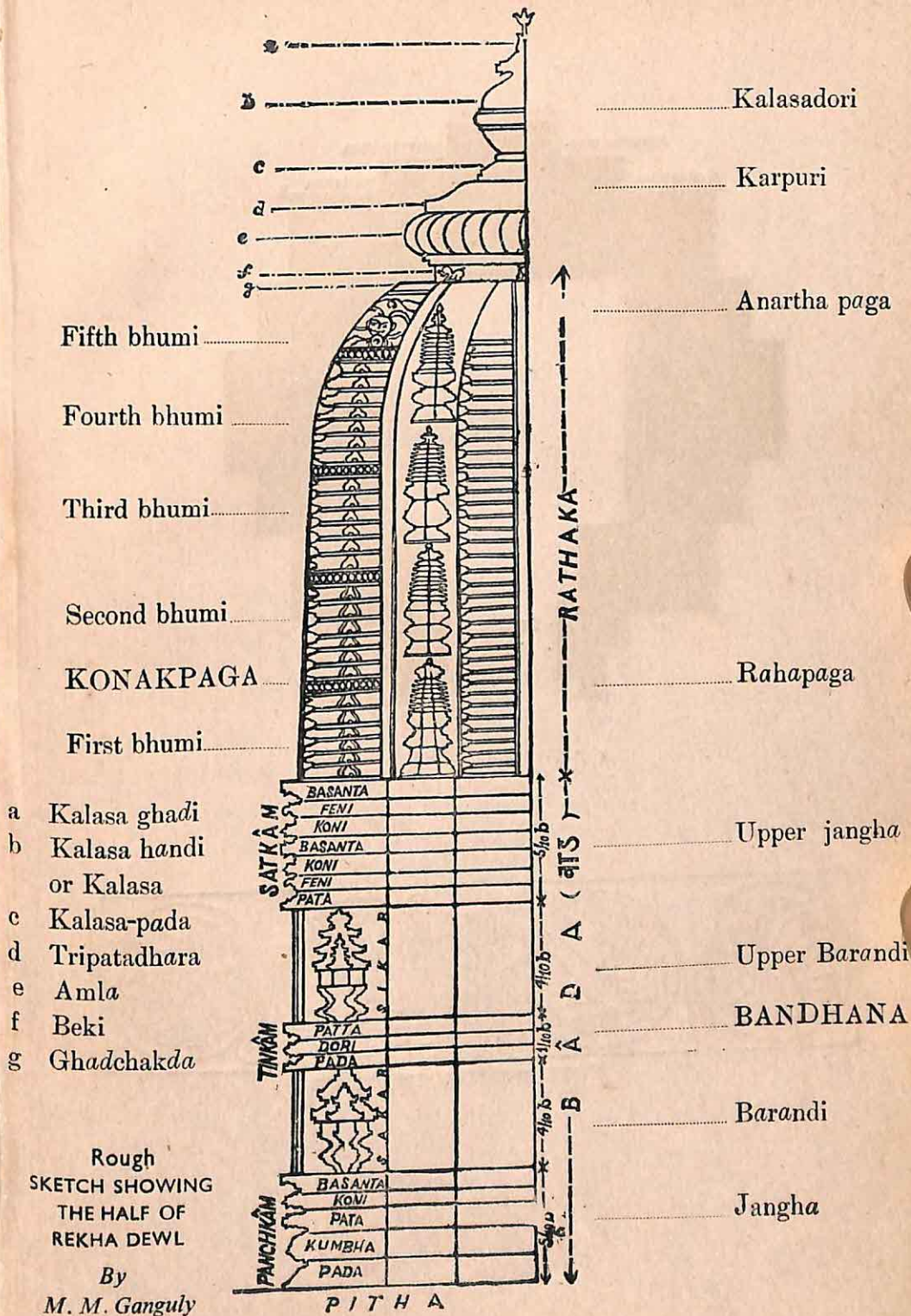
উড়িষ্যার মন্দির নির্মাণে যে সকল প্রস্তর ব্যবহৃত হইয়াছে তন্মধ্যে বালুপ্রস্তর ও laterite-ই প্রধান ; কোন কোন স্থানে মুগ্‌নি বা chlorite প্রস্তরের ধারি বা frieze, cornice প্রভৃতি নির্মাণ করা হইয়াছে। তোরণে দ্বারপাল সম্পর্কে কালিকা পুরাণ স্মরণীয়ঃ

'ক্রমাদ্‌ গণেশৌকৃত্বা তৌ হরো দ্বারি ন্যযোজয়ৎ।' (৪৫ অধ্যায়)
'যদা সা নর্মণে যাতা গৌরী স্মরহরান্তিকম।
তদা ভৃঙ্গিমহাকালৌ দ্বারস্থৌ দ্বারি প্রতিষ্ঠিতৌ॥' (৪৬ অধ্যায়)
ভুবং গতে মহাকালে মানুষস্থে চ ভৃঙ্গিণি।
বেতাল ভৈরবাখ্যে চ তথাভূতে দ্বিজোত্তমাঃ॥ (৮৫ অধ্যায়)

লৌহের ব্যবহার

উড়িষ্যার শিল্পীরা লৌহের ব্যবহার জানিতেন। অনেক মন্দিরের তোরণের ঠিক উপরে লৌহ-কড়ি বা lintel ব্যবহৃত হইয়াছে। কণারক মন্দিরেও লৌহকড়ি স্থাপিত ছিল। প্রস্তরে প্রস্তরে সংযোগ করিবার জন্য iron clamp বা লৌহ-বন্ধনী ব্যবহৃত হইত। লৌহের clamp ব্যবহার করিলে যে মরিচা পড়িয়া প্রস্তর ফাটিয়া যায় তাহা উড়িষ্যার প্রাচীন শিল্পীরা বিশেষ অবগত ছিলেন, কেন না পুরীর মন্দির অপেক্ষা অধিকতর প্রাচীন ভুবনেশ্বর মন্দিরে clamp বহুল পরিমানে দৃষ্ট হয় না। সীসকের ব্যবহারও দৃষ্ট হয়। প্রস্তর খণ্ডের মধ্যে কোন মসলার ব্যবহার করা হয় নাই।

উড়িষ্যার ভাস্কর্য অতি সুন্দর; বালু প্রস্তর না হইয়া মার্বেল প্রস্তর হইলে উড়িষ্যার শিল্পীদের শিল্প নৈপুণ্য আরও উৎকর্ষ প্রাপ্ত হইত সন্দেহ

সূক্ষ্ম শিল্পনৈপুণ্য

নাই। গ্রীক ভাস্করেরা যেমন Acanthus লতা খোদিত করিতে আপনাদের শিল্প কৌশল প্রদর্শন করিয়াছেন তেমনি উড়িষ্যার শিল্পীরা পদ্ম পুষ্পে নৈপুণ্য দেখাইয়াছেন। পদ্ম উড়িষ্যার কেন সমস্ত ভারতের দেবগ্রাহ্য পুষ্প। প্রস্তর মূর্তির উপপীঠ বা pedestal নির্মাণ করিতে দেব দেবীর আসন অথবা পাদ-পীঠ নির্মাণ করিতে

শতদলের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। দেবদেবী কিম্বা প্রণয়ী-যুগলের হস্তেও পদ্মকোরক। উড়িষ্যার শিল্পীরা দেব মন্দির নির্মাণের বিরাটত্ব ও গাম্ভীর্য বিষয়ে তত মনোযোগ না দিয়া সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম শিল্পনৈপুণ্যের দিকে মনোযোগ দিতেন। ইহা ভুবনেশ্বর, মুক্তেশ্বর, রাজারাণী ইত্যাদি মন্দিরে বিশেষ পরিলক্ষিত হয়। আমার বোধহয় দেবমন্দিরে বিরাটত্ব প্রদর্শন করিবার চেষ্টা করাই উচিত। পণ্ডিত ফার্গুসন যথার্থই বলিয়াছেন যে ভুবনেশ্বর মন্দির নির্মাণে যদি এক লক্ষ মুদ্রা ব্যয়িত হইয়া থাকে, তাহা হইলে মন্দিরের সূক্ষ্ম কারুকার্য সম্পাদনে তিনলক্ষ মুদ্রা ব্যয় হইয়া থাকিবে।

পুরুষোত্তম ক্ষেত্র

সকলেই একবাক্যে স্বীকার করেন যে, জগন্নাথ বিগ্রহ ও মন্দির প্রতিষ্ঠার মূলে বৌদ্ধ ধর্ম্ম। একথা আলোচনা করিয়া দেখা যাউক।

১। পূর্বে 'দাথধাতুবংশ' হইতে যে উপাখ্যানটি বিবৃত করা হইয়াছে তাহাতে বালুকা মধ্যে প্রোথিত দন্তের সহিত অরণ্যে প্রোথিত জগন্নাথ মূর্তির অনেকটা সাদৃশ্য আছে।

২। আমরা পূর্বে উৎকল কবি মাগুনিয়া দাস লিখিত দারুব্রহ্ম হইতে যে বচনটি উদ্ধৃত করিয়াছি তাহাতে জগন্নাথ যে বুদ্ধের নামান্তর তাহার ইঙ্গিত আছে।

৩। আশ্চর্যের বিষয় জগন্নাথ, সুভদ্রা ও বলরামের মূর্তির সহিত হিন্দু বা সভ্য জগতের কোন দেবদেবীর বিন্দুমাত্রও সাদৃশ্য নাই। ক্ষিতি অপ, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম—এই পঞ্চ ভূত জ্ঞাপক বৌদ্ধ স্তূপ এবং জগন্নাথ, সুভদ্রা ও বলরামের মূর্তির বিশেষ সৌসাদৃশ্য আছে।

৪। বৌদ্ধ ধর্মে জাতিভেদ নাই; জগন্নাথ ক্ষেত্রেও আচন্ডল সর্বজাতি এক-সঙ্গে মহাপ্রসাদ ভক্ষণ করে। শবর বা চন্ডাল জাতীয় পাচক ও পূজক জগন্নাথের ভোগ রন্ধন ও পূজাদি করিয়া থাকে।

৫। বৌদ্ধদিগের বুদ্ধ, ধর্ম ও সঙ্ঘই জগন্নাথ, সুভদ্রা ও বলরাম নাম গ্রহণ করিয়া হিন্দুর মন্দিরে বিরাজ করিতেছেন বলিয়া বোধ হয়।

৬। জগন্নাথ দেবের রথযাত্রার সহিত বুদ্ধদন্তের রথযাত্রার সাদৃশ্য আছে। চীন পরিব্রাজক ফা-হিয়ান তাতার দেশের অন্তর্গত খোটান নগরে বৌদ্ধ মহোৎসব দর্শন করেন। সেই মহোৎসবে তিনি একটি রথে তিনটি মূর্তি দর্শন করেন। এই তিনটি মূর্তি বুদ্ধ, ধর্ম ও সঙ্ঘের। অনেকে অনুমান করেন যে বৌদ্ধদিগের রথযাত্রা হইতে উড়িষ্যার রথযাত্রার প্রবর্তনা হইয়াছে। জগন্নাথ ও ভুবনেশ্বরের রথযাত্রা-উৎসব প্রসিদ্ধ। কণারকে সূর্যদেবের রথযাত্রা উৎসব প্রচলিত ছিল।

বৌদ্ধ ধর্মমতে জন্মই যত দুঃখের কারণ; জন্মের নাশ করাই পুরুষার্থ। বৌদ্ধেরা এই জন্যই নির্বাণ মুক্তির আকাঙ্ক্ষা করেন। প্রবাদ আছে যে 'রথেচ বামনং দৃষ্টবা পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে'। 'পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে' কথায় যেন আমরা নির্বাণের আভাষ পাই।

৭। সমস্ত হিন্দু মন্দির দক্ষিণ কিম্বা পশ্চিমদ্বারী করিয়া নির্মিত হয়। কিন্তু জগন্নাথের মন্দির ও উড়িষ্যার যাবতীয় মন্দিরগুলি প্রায়ই পূর্বদ্বারী। বৌদ্ধেরা তাঁহাদের মন্দিরের দ্বারগুলি পূর্ব দিকে নির্মাণ করিতেন।

একণে সংক্ষেপে পুরীর শ্রীমন্দিরের বিষয় যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাউক। শ্রীমন্দির যে স্থানের উপর নির্মিত তাহার নাম নীলাচল; মন্দিরটি

শ্রীজগন্নাথদেবের
শ্রীমন্দির

২২ ফুট উচ্চ Plinth বা পোতার উপর নির্মিত। বহিঃ প্রাচীরের দৈর্ঘ্য ৬৭০ ফুট এবং প্রস্থ ৬৪০ ফুট এবং উচ্চতা ২০ হইতে ২৪ ফুট। প্রাচীরের চারিধারে চারিটি তোরণ বিদ্যমান: সিংহদ্বার, হস্তিদ্বার, অশ্বদ্বার ও খাঞ্জাদ্বার। সিংহদ্বারের সম্মুখে এক অখণ্ড ক্লোরাইট (chlorite)

প্রস্তরে নির্মিত ৩৪ ফুট উচ্চ অরুণ স্তম্ভ রহিয়াছে। ২২টি ধাপ উত্তীর্ণ হইলে ভিতরের অঙ্গন; এই অঙ্গন পুনরায় প্রাচীর বেষ্টিত; অন্তঃপ্রাচীর দৈর্ঘ্যে ৪২০ ফুট এবং প্রস্থে ৩১৫ ফুট; ইহারও চারিটি তোরণ আছে।

সর্ব পূর্বদিকে ভোগ মন্দির অবস্থিত, দৈর্ঘ্যে ৫৮ ফুট এবং প্রস্থে ৫৬ ফুট; ইহার তোরণের উপর নবগ্রহের খোদিত মূর্তি রহিয়াছে। নাট মন্দির দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে ৮০ ফুট। ইহার পশ্চিমে জগমোহন। ইহাও দৈর্ঘ্যে প্রস্থে ৮০ ফুট এবং উচ্চে ১২০ ফুট। তাহার পশ্চাতে বিমান বা বড় দেউল; দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে প্রায় ৮০ ফুট এবং উচ্চে ১৯২ ফুট। বিমানটি পূর্বোক্ত পঞ্চশ্রেণী বিভাগের সর্ব শ্রেষ্ঠ শ্রেণী বা অদ্ভুত শ্রেণীর অন্তর্গত। কেননা মানসারের মতে অদ্ভুত বিমানের প্রস্থকে ৭/৩ দিয়া গুণ করিলে উচ্চতা পাওয়া যায়। বিমানের প্রস্থ ৮০ ফুট। হিসাব করিলে উচ্চতা ৮০×৭/৩=১৮৭ ফুট হয়। মন্দিরটি প্রকৃত প্রস্তাবে ১৯২ ফুট উচ্চ করিয়া নির্মিত করা হইয়াছে।

ভুবনেশ্বর মন্দিরের ন্যায় পুরীর মন্দিরে তেমন সূক্ষ্ম কারুকার্য দৃষ্ট হয় না। এতবড় বিরাট মন্দিরে সূক্ষ্ম শিল্প নৈপুণ্যের উৎকর্ষ প্রদর্শন করা বড় সহজ ব্যাপার নহে। তাহা হইলে ইহা পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মন্দির হইত। এই অভ্রভেদী মন্দিরের বিরাটত্বে ও গাম্ভীর্যে হৃদয় ভরিয়া যায়। কিন্তু পণ্ডিত ফার্গুসনের চক্ষে তেমন ভাল লাগে নাই। তাই তিনি পুরীর মন্দিরকে উড়িষ্যা-স্থাপত্যের নিম্নতম স্তরে স্থাপিত করিয়াছেন। তিনি বলেন এই মন্দির নির্মাণের পর উড়িষ্যা শিল্পের আর পুনরুন্নতি হয় নাই।

একটি কথা উল্লেখযোগ্য। শ্রীমন্দিরের বহিঃ প্রাচীরের শীর্ষদেশ ক্রমনিম্ন বা ঢালু না হইয়া তাহার উপর দন্ত পংক্তির ন্যায় প্রস্তর খণ্ড (Serrated battlements) স্থাপিত করা হইয়াছে। ইহাতে শোভার বিকাশ হইয়াছে।

ইউরোপীয় প্রত্নতত্ত্ববিদেরা ইহাতে কিন্তু Saracenic বা মুসলমান স্থাপত্যের গন্ধ পাইয়াছেন।

ভুবনেশ্বরের মন্দিরের প্রাচীর শীর্ষ এরূপ নহে। আর একটি কথা বলিয়া আমরা অন্য কথার অবতারণা করিব। পুরীর মন্দিরের অনেক স্থলে অশ্লীল বিলাস-ভাবাপন্ন মূর্তি স্থাপিত আছে। ইহা যে কেন স্থাপিত হইয়াছে তাহা একটি প্রহেলিকা।

শ্রীক্ষেত্রের মন্দিরের বিবরণ শ্রীক্ষেত্রের মন্দির মন্দির প্রাঙ্গণের বিবরণ এইরূপ ঃ

মন্দিরের অঙ্গনের মধ্যে অসংখ্য দেব মন্দির আছে। পূর্বে বলিয়াছি জগন্নাথের মন্দির হিন্দুর Pantheon। এখানে যাবতীয় দেবদেবীর সমাবেশ হইয়াছে। কাশী বিশ্বনাথ, রামচন্দ্র, জয়বিজয়, বদরী নারায়ণ, শ্রীরাধাকৃষ্ণ, বটকৃষ্ণ, মঙ্গলাদেবী, মার্কণ্ডেয়েশ্বর, বটেশ্বরলিঙ্গ, ইন্দ্রাণী, সূর্যদেব, ক্ষেত্র-পাল, নরসিংহদেব, গনেশ, ভূষণ্ডী কাক, বিমলা, লক্ষ্মী, সর্ব্বমঙ্গলা নাম্নী-কালী, সূর্যনারায়ণ, পাতালেশ্বর, শীতলা,মাধব, ইত্যাদি এবং বুদ্ধদেব ও গৌরাঙ্গদেব বিরাজিত আছেন। যাহার উপর জগন্নাথ বিগ্রহ স্থাপিত তাহার নাম রত্ন বেদী। ইহা দৈর্ঘ্যে ১৬ ফুট এবং উচ্চে ৪ ফুট। ইহা একটি সিদ্ধ পীঠ বলিয়া পূজিত।

১। ভোগমণ্ডপ, নাটমন্দির, জগমোহন ও বিমানযুক্ত প্রধান মন্দির। এই সম্পর্কে পূর্বেই আমরা আলোচনা করিয়াছি।

২। মুক্তিমণ্ডপ—প্রধান মন্দিরের জগমোহনের দক্ষিণে স্তম্ভবিশিষ্ট সম-চতুর্ভূজ মণ্ডপ। প্রতি ভূজ ৩৮ ফুট। এখানে পণ্ডিতবর্গ শাস্ত্রপাঠ ও আলোচনাদি করেন। ১৬টি ক্লোরাইট স্তম্ভের উপর পিরামিড-সদৃশ চূড়া

অবস্থিত। ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম পাদে উড়িষ্যার রাজা প্রতাপ রুদ্র এই মুক্তি-মণ্ডপ নির্মাণ করেন।

৩। বিমলার মন্দির—স্থাপত্যের দিক হইতে ইহার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য না থাকিলেও তান্ত্রিকেরা ইহার সর্বাধিক গুরুত্ব স্বীকার করেন। তাঁহাদের মতে বিমলাই পুরুষোত্তম ক্ষেত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবী এবং জগন্নাথ দেব তাঁহার ভৈরব মাত্র। আমরা বিভিন্ন হিন্দু শাস্ত্রেও দেবী বিমলার উল্লেখ পাই।

'গয়ায়াম্ মঙ্গলা নাম বিমলা পুরুষোত্তমে॥' (মৎস্য পুরাণ)
'নটস্য পশ্চিমে ভাগে বিমলা বিমলে প্রদা।
তস্যাদর্শন মাত্রেণ বিদ্যাবান্ জায়তে নরঃ॥' (কপিল সংহিতায়াম)
'মঙ্গলা বটমূলে তু পশ্চিমে বিমলা তথা॥' (উৎকল খণ্ড)

শারদীয়া মহাষ্টমীতে এখানে মাত্র একটি পশুবলি হয়। পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে ইহাই সম্ভবতঃ একটি ব্যতিক্রম।

৪। মহালক্ষ্মীর মন্দির—এইরূপ অনুমিত হয় যে গঙ্গ বংশের স্থাপয়িতা চোড় গঙ্গ এই মন্দির নির্মাণ করান। অতএব ইহা প্রধান মন্দিরের সমকালীন। বিমান, জগমোহন, নাটমন্দির ও ভোগমণ্ডপ—এই চারিটি অঙ্গবিশিষ্ট এই মন্দিরটি সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য।

৫। ধর্মরাজের বা সূর্য নারায়ণের মন্দির—জনশ্রুতি এইরূপ যে, কণারক হইতে সূর্য, চন্দ্র ও নারায়ণের মূর্তি এই মন্দিরে সপ্তদশ শতাব্দীতে পুরুষোত্তমদেবের পুত্র নরসিংহদেবের রাজত্বকালে আনীত হয়। কিন্তু বুদ্ধ-মূর্তিটি এই মন্দিরে কতকাল যাবৎ আছে তাহার ইয়ত্তা নাই। এই মন্দিরের

তিনটি অংশ পরস্পর সংলগ্ন, এইরূপ কদাচিৎ লক্ষিত হয়। এই বৈশিষ্ট্য ভিন্ন এই মন্দিরের স্থাপত্য আদৌ উল্লেখযোগ্য নয়।

৬। পাতালেশ্বরের মন্দির—মন্দিরের গর্ভগৃহের বামপার্শ্বে উৎকীর্ণ শিলালিপির প্রথম ছত্র হইতে এই মন্দিরের কাল নিরূপণ করা যাইতে পারেঃ

'স্বস্তি শ্রীঅনঙ্গভীমদেব মহারাজরাজস্বস্তি শ্রী—'।

মন্দিরটি এমনভাবে নির্মিত যে ইহাকে ভূপ্রোথিত মনে হয়। সোপানশ্রেণী বিগ্রহের সমীপে নামিয়া গিয়াছে।

৭। আনন্দবাজার—এইখানে প্রসাদ বিক্রয় হয়।

৮। স্নানবেদী—স্নানযাত্রার সময়ে দেবতাদিগকে স্নানের জন্য এই স্থানে লইয়া যাওয়া হয়। ইহা আনন্দবাজারের উত্তরে অবস্থিত।

৯। রন্ধনশালা—ইহা একটি সাধারণ দালান। নাটমন্দিরের সঙ্গে একটি আচ্ছাদিত সঙ্কীর্ণ পথ দ্বারা ইহা সংযুক্ত আছে।

১০। বৈকুণ্ঠ বা বৈকুণ্ঠধাম—দ্বিতল হস্তীদ্বারের নিকট অবস্থিত। এই স্থানে ধনী যাত্রিগণ টাকা জমা দিয়া 'আটকিয়া' বাঁধিয়া থাকেন। এইস্থানে প্রতি বৎসর কলেবর চিত্রিত হয় এবং ইহার নিকটে প্রায়ই দ্বাদশ বৎসরান্তে কলেবর পুনর্নির্মিত হয়।

শ্রীমন্দিরের অভ্যন্তরে রত্নবেদীর উপর জগন্নাথদেব, হলধর, মধ্যে অভিমন্যু-মাতা সুভদ্রা। একপার্শ্বে সুদর্শনচক্র। মূর্তি চতুষ্টয়ের সম্মুখে সুবর্ণ নির্মিত লক্ষ্মী মূর্তি বামে; দক্ষিণে রজতময় শুভ্রকান্তি সরস্বতী। পশ্চাতে নীলমাধব। এই সপ্তমূর্তি রত্নবেদীর অপূর্ব রত্ন।

শ্রীমন্দির ব্যতীত শ্রীক্ষেত্রের বিভিন্নস্থানে আরও অন্যান্য যে সকল মন্দির অথবা তীর্থক্ষেত্র রহিয়াছে তাহাদের মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি উল্লেখযোগ্য ঃ

গুণ্ডিচাবাড়ী, লোকনাথ মন্দির, মার্কণ্ডেয়শ্বর মন্দির, শ্বেত গঙ্গা, যমেশ্বর, স্বর্গদ্বার, চক্রতীর্থ, কানপাতা হনুমান, বিদুরপুরী, মহোদধি, সুদামা-পুরী, আঠারনালা, এবং সাক্ষীগোপাল।

গুণ্ডিচাবাড়ী

গুণ্ডিচাদেবী রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নের স্ত্রী। এই রাজা জগন্নাথ মন্দির নির্মাণ করেন। গুণ্ডিচাবাড়ীকে গুণ্ডিচাগড় বা গুঞ্জাবাড়ী বা জগন্নাথের মাসীর বাড়ী বলে। মন্দির উদ্যান পরিবেষ্টিত। মন্দিরের প্রাঙ্গন বিলক্ষণ প্রশস্ত এবং প্রাচীরবেষ্টিত। প্রাঙ্গন ৪৩২ ফুট লম্বা, ৩২১ ফুট চওড়া এবং প্রাচীর ২০ ফুট উচ্চ। পশ্চিম ও উত্তর দিকে দুইটি দ্বার আছে—সিংহদ্বার ও বিজয়দ্বার। মন্দিরটি চারিভাগে বিভক্ত—বিমান, জগমোহন, নাট-মন্দির এবং ভোগমণ্ডপ।

গুণ্ডিচাখ্যাং মহাযাত্রাং যে পশ্যন্তি মুদান্বিতাঃ।
সর্বপাপবিনির্মুক্তা যান্তি তে ভবনং মম॥
(কপিল সংহিতা ৪ অ, ২৮ পৃ।)

জগন্নাথদেব, সুভদ্রা, বলরামদেব সাতদিন মাসীর বাড়ীতে অবস্থান করিয়া তাঁহার আদর আপ্যায়নে পরিতৃপ্ত হইয়া পুনর্যাত্রায় নবমী তিথিতে শ্রীমন্দিরে প্রত্যাবর্তন করেন। রথের পূর্ব তারিখে পুরীর রাজা, পুরীর অধিবাসী ও যাত্রীরা আগমন করিয়া মন্দির প্রকাশ্যভাবে পরিস্কার করেন। ইহাকে গুণ্ডিচা মার্জন কহে। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আছে শ্রীচৈতন্যদেব যখন পুরী গমন করেন, তখন তিনি নিজ হস্তে মার্জন কার্য সম্পাদন করিয়াছিলেন।

গুড়িচা মন্দির গেলা করিতে মার্জন।
প্রথমে মার্জনী লয়া করিল শোধন॥

ভিতর মন্দির উপর সব সমার্জিল।
সিংহাসন মাজি চারিভিত শোধিল॥
প্রথমে করিল প্রভু মন্দির প্রক্ষালন।
ঊর্ধ্ব অধঃ ভিত গৃহ মধ্য সিংহাসন॥

এইখানে ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবর আছে, ইহা অতি প্রসিদ্ধ তীর্থ। এই সরোবরে অনেক কচ্ছপ আছে। খাদ্যদ্রব্য দিলে কচ্ছপ দেখিতে পাওয়া যায়। এখানে স্নান ও তর্পণ বিধেয়।

সরোবর সুবিস্তীর্ণ ও চতুর্দিক প্রস্তরে বাঁধান, ইহা লম্বে ৪৮৫ ফুট এবং প্রস্থে ৩৯৬ ফুট। উৎকল খণ্ডে কথিত আছে যে রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন অশ্বমেধ যজ্ঞের দক্ষিণাস্বরূপ যে সকল গাভী দান করিয়াছিলেন তাহাদের খুর-ন্যাসে ইহা খাত হইয়াছে।

ইন্দ্রদ্যুম্নসরস্তত্র ইন্দ্রেণ সমপূজিতং।
তত্রাসাদ্য নরো বিপ্রা ইন্দ্রেণ সহ মোদতে।

পুরী মন্দিরের প্রায় দুই মাইল পশ্চিমে লোকনাথ মহাদেবের মন্দির।

লোকনাথ মন্দির

মন্দিরের নিকট প্রশস্ত সরোবর। মন্দির-প্রাঙ্গণ প্রাচীর-বেষ্টিত। লিঙ্গ প্রায়ই জলে ডুবিয়া থাকে।

মার্কণ্ডেয় সরোবর, নরেন্দ্র সরোবর, ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবর, শ্বেতগঙ্গা,

মার্কণ্ডেয়শ্বর মহাদেবের মন্দির

প্রবেশ দ্বারে বৃষ ও চতুর্দিকে আদ্যনাথ, ষড়ানন, হরপার্বতী, গণেশ, পঞ্চপাণ্ডব ও ধবলেশ্বর লিঙ্গ আছে। মার্কণ্ডেয় হ্রদ পঞ্চতীর্থের অন্যতম।

মার্কণ্ডেয় সরোবর, নরেন্দ্র সরোবর, ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবর শ্বেতগঙ্গা, শিবগঙ্গা প্রভৃতি পবিত্র স্থানে স্নান ও পিতৃতর্পণ বিধেয়। মার্কণ্ডেয়

সরোবরের চতুর্দিক প্রস্তরে বাধান, সোপান প্রস্তর-নির্মিত। ইহা লম্বায় ৮৭৩ ফুট এবং প্রস্থে ৮৩৪ ফুট। ইহার মধ্যে একটি দ্বীপ ও কতকগুলি মন্দির আছে। এই সরোবরে বহু কচ্ছপ আছে। কপিল সংহিতায় উক্ত আছে—

'মার্কণ্ডেয়শ্চ তত্রৈব তীর্থং ত্রৈলোক্য পাবনং'।

শ্বেতগঙ্গা

শ্রীমন্দিরের উত্তরভাগে শ্বেতগঙ্গাতীর্থ অবস্থিত। ব্রহ্ম পুরাণে পুরুষোত্তম মাহাত্ম্যে এই তীর্থ বিশেষ পুণ্যপ্রদ বলিয়া বিখ্যাত।

যমেশ্বরাদি

শ্রীমন্দিরের নিকটে যমেশ্বর, অলাবুকেশ্বর ও কপালমোচন মহাদেবের মন্দিরত্রয়। কথিত আছে, যমেশ্বর পূজায় কোটিলিঙ্গ পূজার ফল, অলাবুকেশ্বর পূজায় অপুত্রক পুত্রবান এবং কপালমোচন পূজা করিলে ব্রহ্মহত্যার পাপ হইতে মুক্ত হয়।

স্বর্গদ্বার ও চক্রতীর্থ

স্বর্গদ্বারে প্রথম স্নান করার নিয়ম। মহাপ্রভু স্বর্গদ্বারেই প্রথম সমুদ্র স্নান করেন। স্বর্গদ্বার পুণ্যতীর্থ। পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে যে কোন স্থানে সমুদ্রে স্নান করিলে পুণ্য হয়। চক্রতীর্থে স্নান করিলে মানব শিবলোক প্রাপ্ত হয়। ইহার অনতিদূরে চক্রনারায়ণের মন্দির। প্রবাদ যে এই চক্রতীর্থের ধারেই ব্রহ্মদারু ভাসিয়া আসে, উহাদ্বারা জগন্নাথদেবের মূর্তি প্রথম গঠিত হয়।

কানপাতা হনুমান, বিদুরপুরী, মহোদধি ও সুদামাপুরী

কথিত আছে, এইখানে হনুমান কান পাতিয়া সাগর তরঙ্গের ভয়ানক শব্দ শ্রবণ করিতেছেন এবং শ্রীমন্দিরকে সাগরের তরঙ্গ হইতে রক্ষা করিতেছেন। বিদুর পুরীতে মহাভারতের উদ্যোগপর্বের বিবরণ স্মরণ করিয়া যাত্রীরা শাক ও খুদের অন্নপ্রসাদ পাইয়া

থাকেন। স্বর্গদ্বারের নিকট অবস্থিত সাগরাংশ মহোদধি তীর্থ নামে প্রসিদ্ধ। এখানে যাত্রীরা মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া সমুদ্রে স্নান করিয়া থাকেন। সুদামাপুরীতে পাতাল গঙ্গা গুপ্ততীর্থ; তৎপরে স্বর্গদ্বার স্তম্ভ। ইহা প্রকাণ্ড প্রস্তর-নির্মিত স্তম্ভ।

আঠারনালা

আঠারনালা ব্রিজটী ২৯০ ফুট লম্বা। ইহা ১৩০০ খৃঃ অব্দে নির্মিত। সেকালে ইহাই পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে প্রবেশের দ্বার ছিল। আঠারনালা হইতেই পুরুষোত্তম ক্ষেত্র আরম্ভ। ইহা মুটিয়া (মধুপুর) নদীর উপর স্থাপিত। হিন্দুদিগের শিল্প-নৈপুণ্যের ইহা একটি স্থায়ী চিহ্ন। আঠারটি ফোকরই প্রস্তর নির্মিত। এরূপে পাথরগুলি জোড়া যে এ পর্যন্ত একটি খিলানের একটি পাথরও স্থানভ্রষ্ট হয় নাই। এই আঠারনালা দেখিয়া স্টার্লিং সাহেব লিখিয়াছেনঃ

'It is built of a ferruginous coloured stone, probably the iron-clay, early in the fourteenth century by Raja Narsinha Dev, the successor of Langora Narasinha Dev, who completed the black pagoda. The Hindus, being ignorant how to turn an arch, substituted in lieu of it the method, often adverted to above, of laying horizontal tires of stones on the pires, the one projecting slightly beyond the other in the manner of inverted stairs, until they approach near enough at top to sustain a keystone or crossbeam, a feature so remarkable in Hindu Architecture that it seems strange it should not have been hitherto particularly noticed in any description of the antiquities of the country. The bridge has eighteen nalas or passages for the water, each roofed in the way described. Its total length is 290

feet, and the height of the central passage eighteen feet and its breadth fourteen feet; of the smallest ones, at each extremity, thirteen and seven respectively, and the thickness of the piers, which have been judiciously rounded on the side opposed to the current, eight and six feet; the height of the parapet, which is a modern addition, is six feet.' (Asiatic Researches, Vol. XV 1824).

সাক্ষীগোপাল

সাক্ষী গোপালের বা সত্যবাদীর মন্দির আধুনিক। ইহার নির্মাণ প্রণালী প্রাচীন দাক্ষিণাত্য প্রণালীর ন্যায় পুরাতন উৎকল প্রণালী। মন্দিরের প্রাঙ্গণ দৈর্ঘ্যে ১৬২ ফুট, প্রস্থে ১৩৮ ফুট। মন্দিরটি ৬৭ ফুট উচ্চ ও কারুকার্যে আবৃত। মন্দিরের পার্শ্বেই সরোবর, সোপান প্রস্তরময়। মন্দিরের প্রাঙ্গণ প্রস্তরনির্মিত প্রাচীর-বেষ্টিত। প্রবাদ যে গোপাল সত্যের জয়ের জন্য সাক্ষী দিতে প্রস্তুত ছিলেন, এই জন্য তাঁহাকে সাক্ষীগোপাল বা সত্যবাদী কহে।

ভুবনেশ্বর

কপিলসংহিতা মতে ভুবনেশ্বরের আর এক নাম চক্রক্ষেত্র; এইস্থানে শ্রীকৃষ্ণের চক্র নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। চক্রক্ষেত্র, একাম্রক্ষেত্র, এবং সাম্ভবক্ষেত্র এই তিন নামেই ভুবনেশ্বর অভিহিত। মহাভারতে ভুবনেশ্বর সম্বন্ধে ইঙ্গিত রহিয়াছে। বনপর্বে আছে যুধিষ্ঠির গঙ্গাসাগরসঙ্গমে স্নান করিয়া লোমশ মুনির আদেশে কলিঙ্গ দেশের মধ্যে বৈতরণী তীর্থ ও তৎতীরস্থ দেবযজ্ঞ স্থান বা যাজপুর এবং তৎপরে বিশ্বকর্মার তপস্যাস্থল স্বয়ম্ভু বন এবং তৎপরে লবণ সাগরের সমীপবর্তী বেদী দর্শন করিলেন।

অতঃ সমুদ্রতীরেণ জগাম বসুধাধিপঃ
ভ্রাতৃভিঃ সহিতো বীরঃ কলিঙ্গান্ প্রতিভারত।
লোমশ উবাচ।
এতে কলিঙ্গাঃ কৌন্তেয় যত্র বৈতরিণী নদী।
যত্রাহযজত ধর্মোহপি দেবাচ্ছরণমেত্য বৈ ॥
ঋষিভিঃ সমুপাযুক্তং যজ্ঞিয়ং গিরিশোভিতং
উত্তরং তীরমেতদ্ধি সততং দ্বিজসেবিতং ॥

এই স্বয়ম্ভু বনই সম্ভববন, ভুবনেশ্বর বা একাম্রবন; এবং বেদীই পুরুষোত্তম ক্ষেত্র। তাহা হইলে আমরা দেখিলাম যে প্রাচীনকাল হইতে

ভুবনেশ্বর হিন্দুর নিকট তীর্থ বিশেষ বলিয়া পরিগণিত ছিল। কপিল-সংহিতায় ইহাকে একাম্রবন বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে, ইহার আর এক নাম গুপ্তকাশী। ভুবনেশ্বরের মন্দির ভুবনেশ্বর স্টেশন হইতে প্রায় দুই মাইল।

ভুবনেশ্বরে দ্রষ্টব্যের মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি উল্লেখযোগ্য: অনন্ত বাসুদেবের মন্দির, বিন্দু সরোবর, ভুবনেশ্বর বা হরিহর মন্দির, পার্বতী মন্দির, গরুড় ও কৃষ্ণস্তম্ভ, একখণ্ড প্রস্তরে নির্মিত কৃষ্ণমূর্তি, সিদ্ধেশ্বর, কেদার-গৌরী ও মুক্তেশ্বর, রাজারাণী, পরশুরামেশ্বর এবং ব্রহ্মেশ্বর মন্দির। সমস্ত মন্দিরের বর্ণনা করা অসাধ্য। তাহা সত্ত্বেও স্থূলভাবে কিছু বর্ণনা করিবার চেষ্টা করিব।

অনন্তবাসুদেবের মন্দিরে কৃষ্ণ বলরামের মূর্তি প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। বলরামের মস্তকের উপরে অনন্তের বহুশিরোমণ্ডিত ফণা ছত্ররূপে বিরাজ করিতেছে। কপিল সংহিতার একাদশ অধ্যায়ে বর্ণিত আছে যে, এই একাম্র কাননে বা ভুবনেশ্বরে, প্রথমে অনন্ত ও বাসুদেব উভয়ে মহাদেবকে বারাণসী হইতে ভুবনেশ্বরে সংস্থাপন করিয়াছিলেন। এই জন্য দর্শকেরা বিন্দুসরোবরে স্নান ও তর্পণ করিয়া প্রথমত অনন্তবাসুদেবকে দর্শন করেন; পরে ভুবনেশ্বর দর্শন করিতে গমন করেন। কপিল সংহিতায় উক্ত আছে:

তত্র শ্রীবাসুদেবাখ্যো রমানাথো জগদ্‌গুরুঃ।
অনন্তেন সহ শ্রীনেকাকী বিজনে বনে॥
তৎস্থানং পরমং গুহ্যং জ্ঞানাদাতি প্রজাপতিঃ।
ভবানপি ন জানাতি দেবতানাঞ্চ কা কথা॥ ১১ অ, পৃ ২১।

পূর্বে বলিয়াছি যবনদিগকে বিদূরিত করিয়া যযাতি কেশরী উড়িষ্যার

সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি যাজপুরে রাজধানী স্থাপিত করেন। কেশরীবংশীয় রাজারা শৈব ছিলেন। তাঁহারা যে ছয় শতাব্দী ব্যাপিয়া রাজত্ব

যাজপুরে রাজধানী করেন সেই সময়ের মধ্যে উড়িষ্যা দেশে অসংখ্য শিবমন্দির নির্মিত হয়। প্রবাদ আছে, যযাতি কেশরী অযোধ্যা হইতে দশ সহস্র ব্রাহ্মণ উড়িষ্যায় আনয়ন করেন। ইঁহারা শৈব ছিলেন। ইঁহারা উড়িষ্যায় শৈব ধর্মের প্রবর্তনা করেন।

কেশরী বংশীয় চতুর্থ রাজা ললাটেন্দু কেশরীর রাজত্ব সময়ে রাজধানী

রাজধানী ভুবনেশ্বরে অপসারিত

যাজপুর হইতে ভুবনেশ্বরে স্থানান্তরিত হয়। তিনি ৬১৭ অব্দ হইতে ৬৬০ অব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। ললাটেন্দুর সময় শৈবধর্ম দেশধর্ম হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। বারাণসীর যেমন পঞ্চকোশী আছে সেইরূপ ভুবনেশ্বরেরও পঞ্চকোশীর মধ্যে সাত সহস্র মন্দির নির্মিত হয়; তন্মধ্যে এখন প্রায় ৫।৬ শত বিদ্যমান। অধিকাংশ মন্দিরই জীর্ণ অবস্থায় অতীত গৌরবের সাক্ষ্য দিতেছে। অধিকাংশ মন্দিরের বিগ্রহ অদৃশ্য হইয়াছেন।

যযাতি কেশরীই ভুবনেশ্বর মন্দিরের কল্পনা ও আয়োজন করিয়া যান। ইহা কার্যে পরিণত করিবার পূর্বে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। পরে ললাট কেশরীই মন্দির নির্মাণ ও প্রতিষ্ঠা করেন। চীন পরিব্রাজক হিউ এন সিয়াং ললাটের রাজত্ব সময়ে ভুবনেশ্বরের সমৃদ্ধি দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন।

বিন্দু সরোবরের দক্ষিণে প্রায় ৭।৮ শত ফুট দূরে ভুবনেশ্বরের মন্দির অবস্থিত। এই মন্দিরটি হরিহরের এবং পূজা গোপাল মন্ত্রে নিষ্পন্ন হয়। ভুবনেশ্বর লিঙ্গাকার নহেন ছত্রাকার। জগন্নাথদেবের ন্যায় ভুবনেশ্বরেরও রথ-

যাত্রা, দোলযাত্রা, চন্দনযাত্রা ইত্যাদি উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। মন্দিরটি উচ্চ প্রাচীরবেষ্টিত। প্রাচীরের স্থূলতা ৭½ ফুট এবং দৈর্ঘ্য ৫২০ ফুট—প্রাঙ্গন প্রস্থে ৪৬৫ ফুট। পুরীর মন্দির অপেক্ষা ইহার আয়তন অল্প। প্রাচীরের দ্বারগুলির মধ্যে পূর্ব দ্বারটি বৃহৎ; ইহার দুই পার্শ্বে দুইটি বৃহৎ সিংহমূর্তি রহিয়াছে। ইহার সহিত প্রকৃত সিংহের সৌসাদৃশ্য অল্প। বাস্তবিক, উড়িষ্যার খোদিত প্রাণীমূর্তিগুলি ভাস্করের কল্পনাপ্রসূত হইয়া এক বিচিত্র জীব হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

বিমান, জগমোহন, নাট ও ভোগমন্দির এই চারিটি লইয়া মন্দির দৈর্ঘ্যে ৩০০ ফুট এবং প্রস্থে ৭৫ হইতে ৬০ ফুট। সর্বপ্রথম বিমান ও জগমোহন নির্মিত হয়; পরে দ্বাদশ শতাব্দীতে কণারক নির্মাতা নরসিংহ দেবের রাজত্ব-কালে ভোগ মন্দির নির্মিত করিয়া যুক্ত করিয়া দেওয়া হয়। ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র এই দুইটি নবম শতাব্দীতে নির্মিত হইয়াছে বলেন। আমার বোধহয় ইহা ভ্রমাত্মক। ফাগুর্সন সাহেবও দ্বাদশ শতাব্দী বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। মন্দিরটির প্রস্থ, প্রান্তের দিকে ৬৬ ফুট এবং মধ্যস্থলে ৭৫ ফুট। তাহা হইলে গড়ে প্রস্থ ৬৯ ফুট দাঁড়াইতেছে।

আমরা পূর্বে 'মানসার' গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত বচনে দেখিয়াছি যে, বিমান ৫ শ্রেণীতে বিভক্ত। সর্বশ্রেণীর শেষ শ্রেণীর নাম অদ্ভুত। বিমানের উচ্চতা নির্ধারণ করিবার নিয়ম এই যে, প্রস্থকে যথাক্রমে ৭, ৬, ৫, ৪ এবং ৩ দিয়া ভাগ দিয়া ভাগফলকে যথাক্রমে ১০, ৯, ৮ এবং ৭ দিয়া গুণ করিলে যে গুণফল প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহাই বিমানের উচ্চতা। এই নিয়ম অনুসারে বিমানের উচ্চতা ৬৯/৩×৭=১৬১ ফুট হওয়া উচিত। আশ্চর্যের বিষয় মন্দিরের প্রকৃত উচ্চতা ১৬২ ফুট। সুতরাং বলা যায় ভুবনেশ্বরের বিমান আর্য-স্থপতি-বিজ্ঞাননুযায়ী নির্মিত

বিমান আর্যস্থপতি বিজ্ঞানানুযায়ী নির্মিত

৩

হইয়াছে এবং স্থাপত্য বিভাগের শ্রেষ্ঠ বিভাগান্তর্গত অর্থাৎ ইহা 'অদ্ভুত' শ্রেণীর অন্তর্গত।

নাট মন্দিরটি চতুরস্রাকার। দৈর্ঘ্যে প্রস্থে ৫২ ফুট। ইহার ছাদ কতিপয় স্তম্ভ ও লোহার কড়ির উপর রক্ষিত। ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা বলেন যে, এই নাটমন্দির নিশ্চয়ই বিমান ও জগমোহন নির্মাণের পরে যোজনা করিয়া দেওয়া হইয়াছে। জগমোহনের ছাদও কয়েকটি স্তম্ভের উপর স্থাপিত। ইহা দ্বিতল বিশিষ্ট এবং পুরীর জগমোহন অপেক্ষাও সুদৃশ্য।

মন্দিরের বাহিরের দেওয়ালে অনেকগুলি খোপ বা কুলঙ্গি আছে। এই সমস্ত খোপের মধ্যে অষ্ট দিকপালমূর্তি বিরাজিত আছেন। উত্তরে কুবের, পূর্বে ইন্দ্র, দক্ষিণ-পূর্বে অগ্নি, দক্ষিণে যম, দক্ষিণ-পশ্চিমে নিঋতি, পশ্চিমে বরুণ ইত্যাদি অগ্নিপুরাণের নিম্নোক্ত বিবরণ অনুযায়ী অবস্থিত দেখা যায়ঃ

কুম্ভেষ্বাবাহ্য শক্রাদীন্ পূর্বাদৌ পূজয়েৎ ক্রমাৎ
ইন্দ্রাগচ্ছ দেবরাজ বজ্রহস্ত গজস্থিত
পূর্বদ্বারঞ্চ মে রক্ষ দেবৈঃ সহ নমোঽস্তু তে
ত্রাতারমিন্দ্র মন্ত্রেন অর্চয়িত্বা যজেদ্বুধঃ॥
আগচ্ছাগ্নে শক্তিযুত ছাগস্থ বলসংযুত।
রক্ষাগ্নেয়ীং দিশং দেবৈঃ পূজাং গৃহ্ণ নমোঽস্তু তে॥
অগ্নিমূর্ধেতি মন্ত্রেণ যজেদ্বা অগ্নয়ে নমঃ।
মহিষস্থ সমাগচ্ছ দণ্ডহস্ত মহাবল॥
রক্ষ ত্বং দক্ষিণদ্বারং বৈবস্বত নমোঽস্তু তে।
বৈবস্বতং সঙ্গমনমিত্যনেন যজেদ্ যমম্॥
নৈর্ঋতাগচ্ছ খড়গাঢ্য বলবাহনসংযুত।
ইদমর্ঘমিদং পাদ্যং রক্ষ ত্বং নৈর্ঋতীং দিশম॥

এষ তে নৈঋত ইতি যজেদর্ঘ্যাদিভির্গুরুঃ।
মকরারূঢ় বরুণ পাশহস্ত মহাবল ॥
আগচ্ছ পশ্চিমং দ্বারং রক্ষ রক্ষ নমোঽস্তুতে।
উরুংহি রাজা বরুণং যজেদর্ঘ্যাদিভির্গুরুঃ ॥
আগচ্ছ বায়ো সবল ধ্বজহস্ত সবাহন।
বায়ব্যং রক্ষ দেবৈস্ত্বং সমরুদ্ভির্নমোঽস্তুতে ॥
বাত ইত্যাদিভিশ্চার্চেদোং নমো বায়বেঽপি বা।
আগচ্ছ সোম সবল গদাহস্ত সবাহন ॥
রক্ষ ত্বমুত্তরদ্বারং সকুবের নমোঽস্তুতে।
সোমং রাজানমিতি বা যজেৎ সোমায়ে বৈ নমঃ ॥
আগচ্ছেশান সবল শূলহস্ত বৃষস্থিত।
যজ্ঞমণ্ডপস্যৈশানীং দিশং রক্ষ নমোঽস্তুতে ॥
(অগ্নিপুরাণে দিক্‌পতিযাগো নাম ষটপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ ॥)

এই সব দিকপতিগণ ব্যতীত এই মন্দিরের চারিধারে বিলাস-লাবণ্যযুক্ত অশ্লীল নরনারী-মূর্তি বিদ্যমান; কিন্তু পুরীর মন্দির অপেক্ষা সেগুলি সংখ্যায় অল্প। আরও কত মূর্তি রহিয়াছে তাহা বুঝিতে পারিলাম না।

ভুবনেশ্বর মন্দিরের পার্শ্বে নিশাগণেশ নামক প্রকাণ্ড গণেশ, কার্তিক ও নিশাপার্বতী আছেন। নিশাপার্বতীর উপর যে কারুকার্য রহিয়াছে তাহা দেখিলে মুগ্ধ হইতে হয়। প্রস্তর খোদিয়া পার্বতীর যে পরিধেয় নির্মাণ করা হইয়াছে তাহা অতুলনীয়।

ভুবনেশ্বর মন্দিরে প্রস্তরের উপর এমন সুন্দর কারুকার্য খোদিত করা হইয়াছে যে, বোধহয় মন্দির নির্মাণ অপেক্ষা শিল্পকার্যে অধিক ব্যয় হইয়া থাকিবে।

মুক্তেশ্বর ও পার্বতী মন্দিরের কারুকার্য এমনই সুন্দর যে চক্ষু ফিরাইয়া লইতে ইচ্ছা করে না। মুক্তেশ্বরের সম্মুখে একটি অখন্ড প্রস্তরের খিলান স্তম্ভোপরি স্থাপিত। ইহার কারুকার্য ও জগমোহনের মধ্যস্থিত চন্দ্রাতপের শিল্পনৈপুণ্য এত সুন্দর যে চক্ষু আবিষ্ট হইয়া আসে। ডাঃ ফার্গুসন যথার্থই বলিয়াছেন যে, "It may be considered the gem of Orissan Architecture."

ভুবনেশ্বরের সজীব মূর্তিগুলি দেখিলে বঙ্কিমচন্দ্রের সেই অমর কথাগুলি স্মরণ-পথে উদিত হয় "পাথর এমন করিয়া যে পালিশ করিয়াছিল, সে কি আমাদের মত হিন্দু? এমন করিয়া বিনা বন্ধনে যে গাঁথিয়াছিল, সে কি আমাদের মত হিন্দু? আর এই প্রস্তর-মূর্তি সকল যে খোদিয়াছিল—এই দিব্য পুষ্পমাল্যাভরণ ভূষিত বিকম্পিত চেলাঞ্চলপ্রবৃদ্ধ সৌন্দর্য, সর্বাঙ্গসুন্দর গঠন, পৌরুষের সহিত লাবণ্যের মূর্তিমান সম্মিলন-স্বরূপ পুরুষ মূর্তি যাহারা গড়িয়াছে তাহারা কি হিন্দু? এই কোপ-প্রেম গর্ব-সৌভাগ্য স্ফুরিতাধরা, চীনাম্বরা, তরলিত রত্নহারা, পীবরযৌবনভারাবনত-দেহা,

> 'তন্বীশ্যামা শিখরিদশনা পক্কবিম্বাধরোষ্ঠী
> মধ্যে ক্ষামা চকিত হরিণী প্রেক্ষণা নিম্ননাভিঃ॥

এই সকল স্ত্রীমূর্তি যাহারা গড়িয়াছে তাহারা কি হিন্দু? তখন হিন্দুকে মনে পড়িল। তখন মনে পড়িল—উপনিষদ, গীতা, রামায়ণ, মহাভারত, কুমার-সম্ভব, শকুন্তলা, পাণিনি, কাত্যায়ন, সাংখ্য, পাতঞ্জল, বেদান্ত, বৈশেষিক—এ সকলই হিন্দুর কীর্তি, এ পুতুল কোন ছার। তখন মনে করিলাম—হিন্দুকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া জন্ম সার্থক করিয়াছি।"

উদয়গিরি-খণ্ডগিরি

ভুবনেশ্বর হইতে পাঁচ মাইল উত্তর-পশ্চিমে খণ্ডগিরি ও উদয়গিরি অবস্থিত। উভয়েই একটি ক্ষুদ্র শৈলের অংশ। একটি গিরিখণ্ডের মধ্যস্থ ব্যবধান পথ ইহাকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়া খণ্ডগিরি ও উদয়গিরি নামে অভিহিত করিয়াছে।

খণ্ডগিরির সানুদেশ, পাদদেশ হইতে ১২৩ ফুট উচ্চ এবং উদয়গিরির উচ্চতা ১১৩ ফুট। এই দুই গিরিখণ্ড পূর্বঘাট পর্বতমালার অংশ বিশেষ। কয়েক ক্রোশের মধ্যে অনেকগুলি গিরিখণ্ড রহিয়াছে। ইহাদের মধ্যে চারিটি উল্লেখযোগ্য—উদয়গিরি, খণ্ডগিরি, ধবলাগিরি বা ধৌলি এবং নীলগিরি। প্রথমোক্ত তিনটি এক্ষণে বৌদ্ধধর্মের কীর্তি ঘোষিত করিতেছে।

খণ্ডগিরির সানুদেশে জৈন মন্দির স্থাপিত। আমি একজন জৈনযাত্রীকে জিজ্ঞাসা করিয়া বুঝিলাম যে ইহা জিনতীর্থঙ্কর স্বয়ম্ভুনাথের মন্দির। কিন্তু কেহ কেহ বলেন যে, ইহা শেষ তীর্থঙ্কর মহাবীর স্বামীর। এই মন্দির মারাঠারা অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে নির্মাণ করেন।

গিরিখণ্ডদ্বয় গুম্ফা বা গুহার দ্বারা পরিপূর্ণ। এই সকল গুম্ফার নির্মাণকাল লইয়া মতভেদ আছে।

উদয়গিরিস্থ রাণীগুম্ফা বা রাণীনহর বা রাণীনুর সর্বশ্রেষ্ঠ। রাণীগুম্ফা দ্বিতল বিশিষ্ট। উত্তর, পূর্ব ও পশ্চিম এই তিনধারে পর্বতগাত্র খোদিত করিয়া গুম্ফা নির্মাণ করা হইয়াছে। মধ্যস্থলে অঙ্গনটি দৈর্ঘ্যে ৪৯ ফুট ও প্রস্থে ২৪ ফুট। দক্ষিণ দিক মুক্ত রাখা হইয়াছে বলিয়া গ্রীষ্মকালে গুম্ফাটি বাসোপযোগী। ঘর-গুলির সম্মুখে দালান বা বারাণ্ডাগুলি স্তম্ভের উপর রক্ষিত। স্তম্ভের উপরিস্থ ব্র্যাকেটের উপর ছাদ স্থাপিত। ব্র্যাকেটগুলির উপর পীবরস্তনী, আয়তলোচনা নারীদিগের মূর্তি খোদিত করা হইয়াছে।

রাণীগুম্ফা

বর্মাচ্ছাদিত দৌবারিকের মূর্তি গুম্ফার দুই পার্শ্বে স্থাপিত হইয়াছে। উপরের তলের মধ্যে চারিটি ঘর বিদ্যমান। ঘরগুলির আয়তন ১৪´×৭´×৩´৯″। উপরের বারাণ্ডার নয়টি স্তম্ভের মধ্যে দুইটি বিদ্যমান। বাহিরের বারাণ্ডা ৬০ ফুট দীর্ঘ ১০ ফুট প্রস্থ এবং ৭ ফুট উচ্চ।

পর্বতগাত্র ভেদ করিয়া গৃহভিত্তি হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গর্ত রাখা হইয়াছে। এই গর্ত হইতে পর্বত-মধ্যস্থ সঞ্চিত জল বহির্গত হইয়া যায়। এই গর্তগুলি না থাকিলে পর্বত-মধ্যে জল সঞ্চিত হইয়া প্রস্তরগুলিকে শ্লথ করিয়া দিয়া স্থানচ্যুত করিত। এইগুলিকে ইঞ্জিনীয়ারিং গ্রন্থে উইপহোলস বলে। রেলওয়ে কাটিং বা টানেল-এর ধারে এইগুলি দৃষ্ট হয়।

রাণীগুম্ফার উত্তর-পূর্ব দিকে গণেশ গুম্ফা অবস্থিত। ইহা দ্বিতল নহে। ইহাতে পাঁচটি স্তম্ভ বিদ্যমান। গুম্ফার দুইধারে দুইটি বিশালকায় হস্তিমূর্তি রহিয়াছে। বারাণ্ডার ভিতরের দেওয়ালে একটি উপাখ্যানমূলক চিত্রের ধারি বা frieze রহিয়াছে। এই উপাখ্যানটি কোন্ পুস্তক হইতে গ্রহণ করা হইয়াছে তাহার কোন স্থিরতা নাই। সীতাহরণের সহিত আংশিকভাবে সাদৃশ্য আছে। ইহা

গণেশগুম্ফা

একটি রমণী হরণের চিত্র। অনেকে অনুমান করেন যে ইহা রাণীগুম্ফা নির্মাণের সময়ে খোদিত হইয়াছিল।

উদয়গিরিতে যে সব গুম্ফা রহিয়াছে তাহার মধ্যে নিম্নলিখিতগুলিই প্রসিদ্ধ: স্বর্গপুরীগুম্ফা, বৈকুণ্ঠ ও যমপুরগুম্ফা, সর্পগুম্ফা, ব্যাঘ্রগুম্ফা ও হস্তিগুম্ফা।

হস্তিগুম্ফা

হস্তিগুম্ফায় শিল্প নৈপুণ্যের কিছুই পরিচয় পাওয়া যায় না, কিন্তু ঐতিহাসিক হিসাবে ইহার মূল্য যথেষ্ট। ইহার গাত্রে প্রাচীন পালি ভাষায় এক বৃহৎ শিলালিপি উৎকীর্ণ রহিয়াছে। এই শিলালিপির কথা পরে বলিব। প্রিন্সেপ, ডাঃ মিত্র প্রভৃতি ইহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এই শিলালিপি হইতে সমস্ত গুম্ফাগুলি নির্মাণের একটি ইতিহাস প্রাপ্ত হওয়া যায়। ডাঃ মিত্র অনুমান করেন যে ইহা খৃঃ পূঃ ৩১৬ হইতে ৪১৬ অব্দের মধ্যে কোন সময়ে খোদিত হইয়াছে।

ব্যাঘ্রগুম্ফা

ব্যাঘ্রগুম্ফাটি উল্লেখযোগ্য। ইহা একখানি প্রস্তর হইতে খোদিত করা হইয়াছে। এই গুহার প্রবেশ দ্বারে একটি ব্যাঘ্রমস্তক মুখ-ব্যাদান করিয়া রহিয়াছে।

সর্পগুম্ফা

উদয়গিরির সর্পগগুম্ফার পরিচয় অগ্নিপুরাণে আছে:

অনন্তো বাসুকিঃ পদ্মো মহাপদ্মশ্চ তক্ষকঃ।
কুলীর কর্কটঃ শঙ্খোহ্যষ্টো নাগাঃ প্রকীর্তিতাঃ॥

মহাভারতে আদিপর্বে সর্পের বিশেষ বিবরণ আছে। উহারা কশ্যপ ঋষির পুত্র, কন্যা—সংখ্যায় সহস্র। সর্পগুম্ফার শীর্ষদেশে একটি ত্রিশির অজগর সর্পের মস্তক খোদিত রহিয়াছে।

খণ্ডগিরিতে তেমন শিল্প নৈপুণ্যের পরিচায়ক গুম্ফা নাই। অনন্ত গুম্ফাই উল্লেখযোগ্য। অনন্তগুম্ফায় দুইটি গৃহ ও সম্মুখে একটি বারাণ্ডা; স্তম্ভের উপর বারাণ্ডা রক্ষিত। গৃহের দেওয়ালে বুদ্ধ প্রতিমূর্তি এবং খিলানগুলির উপরে নরনারী-মূর্তি খোদিত রহিয়াছে।

অনন্তগুম্ফা

আমরা যে গুম্ফায় আশ্রয় লইয়াছিলাম তাহার নাম জৈন গুম্ফা। এই নামে স্থানীয় লোকে ইহাকে অভিহিত করে। ইহার বারাণ্ডার দুই প্রান্তের দেওয়ালে হিন্দু দেবী-মূর্তি খোদিত। স্থানীয় ব্রাহ্মণে ইহার পূজা করেন। তাঁহারাও বলিলেন যে, এইগুলি দুর্গামূর্তি। কিন্তু মাতা এখানে দশভুজা না হইয়া দ্বাদশভুজা। ভিতরের দেওয়ালে অনেকগুলি ধ্যানমূর্তি তীর্থঙ্কর রহিয়াছেন। ইহার পার্শ্বে কোন জৈন তীর্থঙ্করের নগ্ন মূর্তি। ধ্যানী মূর্তিগুলির নিম্নে সতেরটি দেবী মূর্তি রহিয়াছে। ইহা বোধহয় জৈন ধর্মশাস্ত্রোক্ত মহালক্ষ্মীর মূর্তি।

জৈনগুম্ফা

রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রভৃতি সকলে বলেন যে পূর্বোক্ত ধ্যানমগ্ন মূর্তিগুলি বুদ্ধদেবের। আমার বোধ হয় ইহা ভ্রমাত্মক। কেননা, মূর্তিগুলির আসনে বৃষভ, অশ্বাদি চিহ্নগুলি খোদিত। আর এক কথা, প্রত্যেক তীর্থঙ্করের এক-একটি স্বীয় অসাধারণত্ব আছে। যথা আদিনাথের বৃষভচিহ্ন, অজিতনাথের হস্তিচিহ্ন, সম্ভবনাথের অশ্বচিহ্ন। এই সমস্ত চিহ্নগুলি serially বা পূর্বাপর খোদিত আছে।

> বৃষো গজোঽশ্বঃ প্লবগঃ ক্রৌঞ্চোঽব্জং স্বস্তিকঃ শশী।
> মকরঃ শ্রীবৎসঃ খড়গী মহিষঃ শূকরস্তথা
> শ্যেনো বজ্রং মৃগচ্ছাগৌ নন্দ্যাবর্তো ঘটোঽপি চ।
> কুর্মো নীলোৎপলং শঙ্খঃ ফনীসিংহোঽর্হতাং ধ্বজাঃ॥ (হেমচন্দ্র)

ধ্যানমগ্ন মূর্তিগুলি দিগম্বর বা উলঙ্গ। বৌদ্ধমূর্তি কখনও উলঙ্গ নহেন। কিন্তু জৈন ধর্মান্তর্গত দিগম্বরী সম্প্রদায়ের মতে তীর্থঙ্করেরা নগ্ন বা দিগম্বর।

বুদ্ধমূর্তির গাত্রে উত্তরীয়ের ন্যায় বস্ত্র অন্ততঃ উপবীতের ন্যায় থাকিবে। ইঁহাদের গাত্রে কিছুই নাই। আর এক কথা, সেই সমস্ত ধ্যানমগ্ন মূর্তির পার্শ্বে জিন তীর্থঙ্করের নগ্ন, দণ্ডায়মান মূর্তি স্পষ্ট রহিয়াছে। সুতরাং এ-গুলিও নিশ্চয়ই তীর্থঙ্করের মূর্তি। জৈন মন্দিরগুলির সম্মুখে রোয়াকের মত অংশ বিদ্যমান থাকে। এইগুলির সহিতও রোয়াক বিদ্যমান।

জৈনদিগের গুহা খনন

এমনও হইতে পারে যে পূর্বে বৌদ্ধেরা উদয়গিরি পর্বতে গুহা খনন করেন। তাহার বহু পরে জৈনেরা উদয়গিরির সম্মুখস্ত খণ্ডগিরি পর্বতে অধিকাংশ গুহা খনন করেন। উদয়গিরি পর্বতেও যে খনন করেন নাই এমন কথা বলিতেছি না। বৌদ্ধেরা যেখানে যেখানে আপনাদের চৈত্য, স্তূপ ইত্যাদি নির্মাণ করিয়াছেন প্রায় সেইখানেই জৈনেরা আসিয়া মিলিত হইয়াছেন। সারনাথের বৌদ্ধস্তূপের অতি নিকটে জৈনমন্দির রহিয়াছে, বুদ্ধগয়ায়ও জৈন মন্দির নির্মিত হইয়াছে।

স্টার্লিং সাহেব ১৮২০ অব্দে খণ্ডগিরিস্থ দেবসভায় অনেকগুলি জিন তীর্থঙ্করের নগ্নমূর্তি দেখিয়াছিলেন। ডাঃ মিত্র তাহা অবিশ্বাস করেন। অবিশ্বাস করিবার তো কোন কারণ দেখি না।

হস্তিগুম্ফায় স্বস্তিক চিহ্ন

আর একটি কথা বলিয়া আমরা অন্য কথার আলোচনা করিব। হস্তিগুম্ফায় যে পালি শিলালিপির কথা বলিয়াছি তাহাতে স্বস্তিক চিহ্ন আছে। ডাঃ মিত্র তাহাকে বৌদ্ধ স্বস্তিক মনে করিয়াছেন। আমার সহিত

এ সম্বন্ধে একজন জৈনের কথা হইয়াছিল। তিনি বলেন যে উহা জৈন স্বস্তিক; বৌদ্ধ স্বস্তিক নহে, কেননা, তাঁহার মতে জৈন স্বস্তিকের রেখাগুলি clockwise বা দক্ষিণাবর্ত। বৌদ্ধ স্বস্তিকের রেখাগুলি counter-clockwise বা বামাবর্ত। শিলালিপিতে 'অরহন্তং' লিখিত রহিয়াছে বলিয়াই যে বৌদ্ধ অনুমান করিতে হইবে এমন কোন কথা নাই। জৈন শাস্ত্রেও 'অর্হৎ' শব্দ প্রচলিত।

বৌদ্ধ ও জৈন স্থাপত্য

জর্মান পণ্ডিত বাকলার (Buckler) প্রভৃতির কথা ছাড়িয়া দিলে পণ্ডিতেরা বলেন যে বৌদ্ধধর্ম ও ব্রাহ্মণ্যধর্মের মিশ্রণে এবং বৌদ্ধ ধর্মের অধিকাংশ মূলতত্ত্ব গ্রহণ করিয়া জৈন ধর্মের উৎপত্তি হইয়াছে। এইজন্য সাধারণভাবে অনেক সময় বৌদ্ধ ও জৈনধর্মের ভিন্নতা প্রতিপাদন বা স্বরূপ নির্ণয় করিতে ভ্রমে পতিত হইতে হয়। ধর্মে যেমন জৈনধর্ম বৌদ্ধধর্মের ছায়াস্বরূপ, স্থাপত্যে বৌদ্ধ স্থাপত্যের আদর্শেই জৈন স্থাপত্যের বিকাশ। এই জন্যই খণ্ডগিরি, উদয়গিরিতে বৌদ্ধ প্রভাব ও জৈন প্রভাব লইয়া এত তর্ক ও মতভেদ। তথাপি দুই একটি বিষয়ে বৌদ্ধ স্থাপত্য ও জৈন স্থাপত্যের ভিন্নতা দৃষ্ট হয়। বৌদ্ধস্তূপে যেমন rails ও চৈত্য দৃষ্ট হয়, জৈন স্থাপত্যে কোথাও সেইরূপ দৃষ্ট হয় না। গণেশ গুম্ফার দেওয়ালে বৌদ্ধ rails খোদিত আছে। খণ্ডগিরিস্থ দেবসভায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চৈত্যগুলি বৌদ্ধ স্থাপত্যের উদাহরণস্থল। তাহা হইলে আমরা এই সিদ্ধান্ত করিতে পারি যে খণ্ড ও উদয়গিরির প্রসিদ্ধ গুম্ফাগুলি বৌদ্ধ শিল্পের নিদর্শনস্থল। বৌদ্ধদিগের পরে বা সম-সময়ে জৈনরা আসিয়া গুম্ফা নির্মাণ করেন। সমস্ত খণ্ডগিরি, উদয়গিরির মধ্যে বৌদ্ধ মূর্তি অপেক্ষা তীর্থঙ্করের মূর্তিই অধিক দৃষ্ট হয়। সুতরাং জৈন প্রভাব অস্বীকার করিবার কোন কারণ দেখি না। তবে প্রসিদ্ধ গুম্ফাগুলি বৌদ্ধ শিল্পের নিদর্শনস্থল; কেননা, শিলালিপিতে লেখা আছে যে ইহারা কলিঙ্গ রাজগণ কর্তৃত খোদিত হইয়াছে। সেই সময়ে কলিঙ্গ রাজেরা বৌদ্ধ ছিলেন।

খণ্ডগিরির সানুদেশে যে জৈন মন্দির অবস্থিত বলিয়াছি তাহার দক্ষিণ-পশ্চিমে দেবসভা অবস্থিত। সমতল গিরিগাত্রের উপর অনুচ্চ প্রস্তরখণ্ড লম্বভাবে স্থাপিত রহিয়াছে। মধ্যস্থলে একটি উচ্চ স্তম্ভ রহিয়াছে। তাহার গাত্রে বুদ্ধ মূর্তি খোদিত। স্টার্লিং সাহেব ভ্রমক্রমে ইহা জিন তীর্থঙ্করের মূর্তি বলিয়া নির্দেশ করেন। আমার বোধহয় এইস্থানে বৌদ্ধ ভিক্ষু বা তাপস-দিগের সঙ্গম বা মিলনক্ষেত্র ছিল।

দেবসভার পূর্বে পর্বতপৃষ্ঠে একটি ক্ষুদ্র পুষ্করিণী খনন করা হইয়াছে, তাহার নাম আকাশ গঙ্গা। ফাল্গুন মাসেও এখানে জল থাকে। কিন্তু এ-জল পানের অযোগ্য।

প্রস্তর স্থাপত্য গ্রীক আগমনের পূর্ববর্তী

ইউরোপীয় প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা বলেন যে উড়িষ্যার প্রস্তরস্থাপত্য আলেকজান্ডারের আক্রমণের পর যে সব গ্রীক এ-দেশে থাকিয়া যান তাঁহারাই প্রবর্তনা করিয়াছেন। ইহা কতদূর সত্য বিচার করিয়া দেখা যাউক।

গুম্ফাগুলির উপর যে শিলালিপি উৎকীর্ণ রহিয়াছে তাহা পালি ভাষায় লিখিত। পালি ভাষায় খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দী হইতে পরিবর্তন সাধিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে এবং খৃষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীতে বহু পরিমাণে পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে দৃষ্ট হয়। ইহা হইতে আমরা এই অনুমান করিতে পারি যে গুম্ফাগুলি অন্ততঃ খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর পূর্বে নির্মিত হইয়াছে। আর এক কথা এই যে শিলালিপিতে অর্হৎ, বোধিসত্ব ইত্যাদি কথা-গুলি দৃষ্ট হয়। যমপুর শিলালিপিতে আছেঃ 'অরহন্ত প্রসাদনং কলিংগ—য—নানং লোনা কাডাতং—র জিনোনস'—অর্থাৎ অর্হৎদিগের অনুগ্রহে কলিঙ্গ রাজ কর্তৃক খোদিত।

ইহা হইতে আমরা স্থির করিতে পারি যে গুম্ফাগুলি বুদ্ধদেবের পরবর্তী কোন সময়ে খোদিত হইয়াছে। ভগবান বুদ্ধ খৃষ্টপূর্ব ৫ম শতাব্দীতে দেহত্যাগ করেন। আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি যে, গুম্ফাগুলি খৃষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দী ও তৃতীয় শতাব্দীর মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে নির্মিত হইয়াছে।

আর একটি কথা আলোচনা করা যাউক। হস্তীগুম্ফায় যে শিলালিপি আছে তাহা পণ্ডিত স্টার্লিং, প্রিন্সেপ ও ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রভৃতি ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাহাতে লিখিত আছে যে, ঐর (Aira) নামক কলিঙ্গ রাজা দ্বারা এই গুম্ফা নির্মিত হইয়াছিল। তিনি মগধাধিপতি নন্দকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া মগধ রাজ্য জয় করেন। তিনি বারাণসীতে প্রচুর অর্থ দান করেন ইত্যাদি।

ইহা হইতে ডাঃ মিত্র প্রমাণ করিয়াছেন যে ঐর (Aira) খৃষ্টপূর্ব ৪১৬ হইতে ৩১৬ অব্দের মধ্যে কোন সময়ে বিদ্যমান ছিলেন। এই সময়েই হস্তীগুম্ফা নির্মিত হইয়াছিল। ডাঃ মিত্র বলেন, এতদ্দ্বারা প্রমাণ হইতেছে যে, গুম্ফাগুলি আলেকজান্ডারের ভারতাক্রমণের পূর্বে রচিত হইয়াছিল।

স্টার্লিং সাহেব ভ্রমক্রমে এই পালি ভাষায় লিখিত শিলালিপির মধ্যে গ্রীক বর্ণমালার অক্ষর দেখিয়াছেন। ইহা তাঁহার দোষ নহে, কেননা তাঁহার সময়ে বৌদ্ধ গ্রন্থের প্রচার হয় নাই।

গিরিদ্বয় তীর্থে পরিণত

কলিঙ্গরাজ্যের রাজধানী না স্বীকার করিলেও ভুবনেশ্বর যে পুরাকালে বিশেষ সমৃদ্ধিশালী নগর ছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। বৌদ্ধ তাপসেরা বৌদ্ধধর্ম প্রচার করিবার জন্য ভুবনেশ্বরে গমন করেন। নগরে সংসারের কোলাহল মধ্যে বাস করিলে তপস্যার হানি হইতে পারে আশঙ্কা

করিয়া অদূরে খন্ডগিরি ও উদয়গিরি পর্বতে বাস করিতেন এবং তথা হইতে নগরে ধর্ম প্রচার করিয়া যাইতেন। বৌদ্ধ শ্রমণদিগের বাসস্থল হিসাবে গিরিদ্বয় তীর্থে পরিণত হইয়াছিল। এখানে অনেক তীর্থযাত্রীর সমাগম হইত। তাঁহাদের এবং শ্রমণদিগের বাসের জন্য কলিঙ্গ রাজেরা গিরিগাত্র খোদিত করিয়া গুম্ফা নির্মাণ করিয়া দেন। শিলালিপি পাঠে অবগত হওয়া যায় যে ঐর, বিদুঃখ প্রভৃতি কলিঙ্গরাজেরা যথাক্রমে হস্তিগুম্ফা, বৈকুণ্ঠ গুম্ফা প্রভৃতি নির্মাণ করিয়াছেন।

গুম্ফা নির্মাণ পুণ্য কার্য

তীর্থস্থানে দেবালয় নির্মাণ করা যেমন পুণ্যকর কার্যের মধ্যে পরিগণিত হয়, তেমনি এখানেও সাধু সন্ন্যাসীর জন্য গুম্ফা নির্মাণ করিয়া দেওয়া পুণ্যজনক বলিয়া বিবেচিত হইত। সেই জন্য অনুমান হয় রাজা ভিন্ন অনেকে গুম্ফা নির্মাণ করিয়া দিয়াছেন। সেই জন্যই অপেক্ষাকৃত দরিদ্র-নির্মিত গুম্ফা সামান্য বিবর মাত্র। ফাগুর্সন, হান্টার প্রভৃতি পণ্ডিতেরা গুম্ফার আয়তন ও সমৃদ্ধিতে একটা যে ক্রমাভিব্যক্তির আবিষ্কার করিয়াছেন তাহা আমার মতে নিতান্ত ভ্রমাত্মক। ডাঃ মিত্রেরও এই মত। কোন অভ্রভেদী প্রাসাদের পার্শ্বে গৃহস্থের সামান্য বাসগৃহ দর্শন করিলে ইহা অনুমান করা কখনই যুক্তিসঙ্গত নহে যে ক্রমবিকাশের মূলতত্ত্বানুসারে গৃহস্থের অনুচ্চ বাসস্থল প্রাসাদের পূর্বে নির্মিত হইয়াছে। আমাদের বক্তব্য এই যে গুম্ফাগুলির মধ্যে কোনটি যে পূর্বে ও কোনটি পরে নির্মিত হইয়াছে ইহা নিশ্চিত অবধারণ করা অসম্ভব।

গ্রীক প্রভাব পর্যালোচনা

ডাঃ ফাগুর্সন বলেন এ দেশে প্রস্তর স্থাপত্য ছিল না। আলেকজান্ডারের ভারতাক্রমণের সময় ভারতে প্রস্তর স্থাপত্যের সৃষ্টি। ভিনসেন্ট স্মিথ 'Graeco-Roman Influence on the civilisation of India' নামক পুস্তকে এইরূপই লিখিয়াছেনঃ 'No Indian example in stone either

of architecture or sculpture earlier than the reign of Asoka (B.C. 260-232) has yet been discovered and the well known theory of Mr. Fergusson, that the sudden introduction of the use of stone instead of wood for the purposes both of architecture and sculpture in India was the result of communication between the empire of Alexander and his successors and that of the Maurya Dynasty of Chandra Gupta and Asoka, is in my opinion, certainly correct.' (P 108, Journal of the Asiatic Society of Bengal, Vol LVIII—part I). Encyclopaedia Britanica-তেও এই মর্মে লিখিত আছে যে, 'Certain pillars erected by him (i.e. Asoka) and inscribed with his edicts, are the earliest extant architectural remains of India.'

পূর্বোক্ত কথাগুলিতে আমার বক্তব্য, মানবের স্বভাবই এই যে, যে দ্রব্য হাতের সম্মুখে থাকে এবং পর্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যায় এবং বাস নির্মাণোপযোগী তাহা লইয়াই সে আবাসভূমি নির্মাণ করে। ইহা মানবের ধর্ম।

সমালোচক জন রাস্কিন (John Ruskin) এই যুক্তির সমীচীনতা উপলব্ধি করিয়া তাঁহার Seven Lamps of Architecture নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন,

'It's first existence and its earliest laws must, therefore, depend upon the use of materials accessible in quantity and on the surface of the earth, that is to say, clay, wood or stone.'

ভারতে বাস নির্মানোপযোগী প্রস্তর যথেষ্ট ছিল ও আছে। সুতরাং প্রাচীনকাল হইতে যে প্রস্তর স্থাপত্য বিদ্যমান থাকিবে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

আমরা পূর্বে দেখিয়াছি যে প্রধান গুম্ফাগুলি আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণের পূর্বে নির্মিত হইয়াছিল। কোন কোন গুম্ফা ঠিক আক্রমণের সময় বা পরে নির্মিত হইয়াছিল। আক্রমণের সময় বা অব্যবহিত পরে যে গ্রীকেরা সুদূর সিন্ধুতীর হইতে আসিয়া উড়িষ্যায় গুম্ফা খনন করিয়াছিলেন ইহা অনুমান করা বাতুলতা মাত্র। যদি গ্রীকেরা উড়িষ্যায় আসিয়া থাকেন তাহা হইলে আক্রমণের অন্ততঃ এক শতাব্দীকাল গত হওয়া চাই-ই।

আর এক কথা এই যে, প্রস্তর স্থাপত্য আমাদের দেশে ছিল তাহা মানসার, ময়মত, কাশ্যপ প্রভৃতি গ্রন্থ পাঠ করিলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। পাণিনি ব্যাকরণে 'ভাস্কর' কথা প্রাপ্ত হওয়া যায়। অগ্নিপুরাণে প্রস্তর নির্মিত প্রাসাদের নির্মাণ সম্বন্ধে বিধি প্রদত্ত হইয়াছে। মৎস্যপুরাণে উল্লেখ আছেঃ

'শিলান্যাসস্তু কর্তব্যঃ প্রাসাদেতু শিলাময়ে
ইষ্টকানান্তু বিন্যাসঃ প্রাসাদে চেষ্টকালয়ে।'

'আদাবেবং সমাসেন শিলালক্ষণমুত্তমং।
শিলান্যাস বিধানঞ্চ প্রোচ্যতে তদনন্তরং॥

শিলা বা চেষ্টকা বাপি চতস্রো লক্ষণান্বিতাঃ।
প্রাসাদাদৌ বিধানেন ন্যস্তব্যাঃ সুমনোহরাঃ॥'

শ্রীমদ্ ভাগবত, ভবিষ্যপুরাণ, মহানির্বাণতন্ত্রাদিতে এই সম্পর্কে নির্দেশাদি পরিলক্ষিত হয়ঃ

'সুরদ্রুমল তোদ্যান বিচিত্রো পবনান্বিতং।
হেমশৃঙ্গৈর্দিবিস্পৃগ্‌ভিঃ স্ফাটিকাট্টাল গোপুরৈঃ॥'
শ্রীমদভাগবত দশমস্কন্ধ পঞ্চাশদধ্যায়।

'কোটি কোটি গুণং পুণ্যং ফলং স্যাদিষ্টকালয়ে।
দ্বিপরার্ধগুণং পুণ্যং শৈলজে তু বিদুর্বুধাঃ'॥ (ভবিষ্যপুরাণ)
'ইষ্টকগৃহদানে তু তস্মাচ্ছতগুণং ভবেৎ।
ততোহযুত গুণং পুণ্যং শিলাগেহপ্রদানতঃ'॥
মহানির্বাণ তন্ত্র ত্রয়োদশোল্লাস।
তৃণকাষ্ঠময়ে পুণ্যং ময়ৈতৎ কথিতং দ্বিজাঃ।
তস্মাদ্দশগুণং পুণ্যং কৃতেষ্টকময়ে ভবেৎ।
তস্মাদ্দশগুণঞ্চাপি নির্মিতে শৈলমন্দিরে'॥
রঘুনন্দনকৃত মঠ প্রতিষ্ঠাদিতত্ত্বম্।

ফার্গুসন, এনসাইক্লোপিডিয়া, ভিনসেন্ট স্মিথ ইত্যাদির মত ছাড়িয়া দিলেও আমরা এ স্থলে জেনারেল কানিংহাম-কে মধ্যস্থ মানিতে পারি। তিনি Archeological Survey Report III-তে বলিতেছেন যে,

'As the city of Girivraja or old Rajgriha was built by Bimbisara, the contemporary of Buddha, we have another still existing example of Indian Stone building at least 250 years older than the date of Asoka."

কথিত আছে যে যবনেরা ১৪৬ বৎসর ধরিয়া উড়িষ্যায় রাজত্ব করেন। যযাতিকেশরী তাঁহাদিগকে বিদূরিত করিয়া উড়িষ্যার সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা ও তৎপদাঙ্কমার্গী এদেশী পণ্ডিতেরা অমনি অনুমান করিলেন যে গ্রীকেরাই এই যবন এবং তাঁহারাই এই সময়ের মধ্যে শিল্প, ভাস্কর্য সমস্ত উড়িষ্যাবাসীদিগকে শিখাইয়া যান।

আমাদের বক্তব্য, প্রবাদের উপর যে অনুমানের ভিত্তি সংস্থাপিত, তাহার মূল্য কিছুই নাই। দ্বিতীয় কথা, যবন বলিলে আমরা তুরস্ক, পারসীক,

আরবদেশীয়, শক্, হূন, মগ ইত্যাদি বুঝিয়া থাকি। একমাত্র গ্রীক যে বুঝিতে হইবে এমন কথা নাই।

হরিবংশে বর্ণিত আছে যে, রাজা সগর স্বীয় প্রতীজ্ঞা রক্ষা ও গুরুর আজ্ঞা পালনের জন্য যবনদিগের সর্বশিরোমণ্ডন আজ্ঞা প্রচার করিয়া বেদাধ্যয়ন ও বেদবিহিত কর্মানুষ্ঠান হইতে বঞ্চিত করেন। স্মার্ত বৌধায়নের মতে স্বধর্ম ত্যাগের জন্য তাহারা ম্লেচ্ছত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। আমরা যবন ও ম্লেচ্ছ বলিলে একই বুঝিয়া থাকি। যবন ও ম্লেচ্ছ একার্থবাচী। মৎস্যপুরাণে উল্লেখ আছে যে ম্লেচ্ছের গাত্র ঘোর কৃষ্ণবর্ণ—'কৃষ্ণাঞ্জন সমপ্রভা'। গ্রীকেরা কোনকালেই কৃষ্ণাঞ্জন সমপ্রভা নহেন।

আর এক কথা। ম্লেচ্ছেরা ভারতের ভিতরে ও বাহিরে সর্বত্র বাস করিতেন। বৃহৎ পরাশর সংহিতায় আছে যে—

'হিমপর্বতো বিন্ধ্যাদ্রৌ বিনাশন প্রয়াগয়োঃ।
মধ্যেতু পাবনো দেশো ম্লেচ্ছ দেশস্ততঃ পরম্ ॥'

অর্থাৎ হিমালয় ও বিন্ধ্যাদ্রির মধ্যে এবং বিনাশন (সরস্বতীর অন্তর্ধান প্রদেশ) ও প্রয়াগের মধ্যবর্তী স্থানে পুণ্যদেশ, তাহার বাহিরে ম্লেচ্ছদেশ। সুতরাং যবন বা ম্লেচ্ছ বুঝাইতে ভারতের আদিম অধিবাসীকেও বুঝাইতে পারে।

মহাকবি কালিদাস যবন সংজ্ঞায় পারসিকদিগকে অভিহিত করিয়াছেন। রঘুবংশের চতুর্থ অধ্যায়ে রঘুর দিগ্বিজয় প্রসঙ্গে বলিতেছেন—

'পারসিকাংস্ততো জেতুংপ্রতস্থে স্থলবর্ত্মনা।
ইন্দ্রিয়াখ্যানিব রিপুংস্তত্ত্বজ্ঞানেন সংযমী ॥

যবনীমুখপদ্মানাং সেহে মধুমদং ন সঃ।
বালাতপমিবাব্জানামকালজলদোদয়ঃ ॥’

আমাদের বক্তব্য এই যে, যবন বলিতে গ্রীক বুঝাইতেছে কি না, কিছুই নির্ণয় করিতে পারা যায় না; বরং আমরা শাম্ব পুরাণে দেখিতে পাই যে সূর্যদেব শাম্বকে উড়িষ্যান্তর্গত কোণার্কের মন্দিরে তাঁহার পূজার জন্য মগ, মামগ প্রভৃতি জাতিকে আনিতে আদেশ দিতেছেন। যথা ঃ

‘ন যোগ্যঃ পরিচর্যায়াং জম্বুদ্বীপে মমানঘ।
মম পূজাপরান্ কৃত্বা শাকদ্বীপাদিহানয়॥
মগশ্চ মামগাশ্চৈব মানসা মন্দগাস্তথা।
তন্মগান্ মমপূজার্থং শাকদ্বীপাদিহানয়॥’

গ্রীকেরা যে খণ্ডগিরির স্থাপত্যে আদৌ প্রভাব বিস্তার করেন নাই তাহা আমরা আর একটি কথা হইতে বুঝিতে চেষ্টা করিব।

আকারভেদে গ্রীক ও আর্যস্তম্ভের মধ্যে প্রভেদ অনেক। গ্রীকদের স্তম্ভ-বপু বা Shaft সরল ও গোল, কিন্তু ভারতবর্ষীয়দিগের সরল, গোল, চতুরস্র, অষ্টকোণ, ষড়কোণ বিশেষে নানা প্রকারের স্তম্ভ আছে (P 39—The Architecture of the Hindus—by Ram Raj। রামরাজ তাঁহার পুস্তকে মানসার হইতে স্তম্ভ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত পারিভাষিক সংজ্ঞাগুলির উল্লেখ করিয়াছেন ঃ চারিপলযুক্ত স্তম্ভের নাম ব্রহ্মকাণ্ড, পাঁচপলযুক্ত শিবকাণ্ড, ষড়পলে স্কন্দকাণ্ড, অষ্টপলে বিষ্ণুকাণ্ড, ষোলপলে রুদ্রকাণ্ড।

গ্রীক ও আর্য-স্তম্ভের তুলনা

আমরা খণ্ডগিরির যে গুম্ফায় আশ্রয় লইয়াছিলাম তাহার স্তম্ভগুলি অষ্টপল যুক্ত বা বিষ্ণুকাণ্ড।

আর একটি কথা উল্লেখযোগ্য ঃ মানসার গ্রন্থে স্তম্ভ নির্মাণের অনেক-গুলি নিয়ম আছে; আমি তাহা খণ্ডগিরির স্তম্ভগুলিতে প্রয়োগ করিয়া দেখিয়াছি। নিয়মটি এই—স্তম্ভকে যদি শীর্ষ হইতে পাদমূল পর্যন্ত ক্রম-স্থূলভাবে নির্মাণ করা যায়, তাহা হইলে স্তম্ভ-বপুর পাদমূলের ব্যাস দ্বারা উচ্চতাকে ভাগ করা হইলে যে ভাগফল প্রাপ্ত হওয়া যায় স্তম্ভ-বপুর শীর্ষব্যাস পাদমূলের ব্যাস অপেক্ষা তত অংশ ন্যূন হইবে।

আমাদের আলোচ্য স্তম্ভটি অষ্টপল যুক্ত বা বিষ্ণুকাণ্ড। ইহার পাদ-মূলের ব্যাস প্রায় ১ ফুট এবং বন্ধ বা moulding-এর নিম্ন পর্যন্ত স্তম্ভ-বপু উচ্চতায় ৪ ফুট। পূর্ব নিয়মানুসারে অঙ্কপাত করিলে শীর্ষস্থ ব্যাস ৯ ইঞ্চি হয়। আশ্চর্যের বিষয়, শীর্ষস্থ ব্যাস ৯ই ইঞ্চি নির্মাণ করা হইয়াছে। গ্রীক স্থপতিরা স্তম্ভের ঢাল বা ক্রমনিম্নতা অন্য হিসাবে দিতেন।

খণ্ডগিরির cornice বা প্রস্তরাগ্র আদৌ গ্রীক কার্নিশের মত নহে। খণ্ড গিরির স্তম্ভের capital বা বোধিকার সহিত গ্রীক বোধিকার আদৌ সৌসাদৃশ্য নাই। খোদিত মূর্তিগুলির বেশভূষা, অঙ্গসৌষ্ঠব, অঙ্গের গঠন ইত্যাদি ভারতবর্ষীয়, আদৌ গ্রীক নহে। সে মৌলিবন্ধ ভারতবর্ষ ভিন্ন আর কোথাও দৃষ্ট হয় না। গ্রীক চক্ষুর সে স্নেহ-প্রদীপ্ত ভাব এদেশীয় চক্ষে তেমন দৃষ্ট হয় না। এখানকার মূর্তিগুলির সমস্ত চক্ষু এক ছাঁচে ঢালা—অতিশয় দীর্ঘ হইয়া সঙ্কুচিত হইয়াছে। উড়িষ্যার শিল্পীরা শরীর অনুকরণ বিষয়ে তেমন আগ্রহী ছিলেন না। তাঁহারা আসন, মুদ্রা ইত্যাদি দেখাইতে ব্যস্ত।

খণ্ডগিরির স্তম্ভ গ্রীক সদৃশ নহে

খণ্ডগিরির সমস্ত নারীমূর্তিই পীবরস্তনী। এ-প্রকার পীবর বা বর্তুলাকার স্তন গ্রীক নারীমূর্তিতে দৃষ্ট হয় না। বেশভূষায় গ্রীক প্রভাব আদৌ লক্ষিত

হয় না। কেবল উদয়গিরিস্থ গণেশ গুম্ফার দ্বারে যে দৌবারিক রহিয়াছে, তাহার পদদেশে যে পাদুকা রহিয়াছে তাহা ইউরোপীয় বুটের ন্যায়। এই একটি সামান্য প্রমাণ হইতে গ্রীক প্রভাবের আবিষ্কার করা আমি বাতুলতা বা অনুতাপ্রিয়তা মনে করি। কেননা ইহার কোন প্রমান নাই যে শক্, হুন, মগ ইত্যাদি জাতিরা ঐ প্রকার পাদুকা ব্যবহার করিতেন না। কিম্বা হইতে পারে গ্রীকদের ব্যবহার করিতে দেখিয়া উড়িষ্যা শিল্পীরা তাহা প্রস্তরে মুদ্রিত করিয়া রাখিয়াছে। ইহাতে কিছু আসিয়া যায় না।

যতক্ষণ না স্পষ্ট প্রমাণ প্রাপ্ত হই ততক্ষণ আমরা কখনই উড়িষ্যা স্থাপত্যে গ্রীক স্থাপত্যের প্রভাব স্বীকার করিব না। যে দেশ মনোবিজ্ঞানে, নীতি-বিজ্ঞানে, রাজনীতি, দর্শন, বিজ্ঞান সর্ববিষয়ে উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল তাহারা যে স্থাপত্যে উৎকর্ষ লাভ করিতে পারে তাহাতে আর আশ্চর্য কি?

পণ্ডিত মোক্ষমূলর এই দেশের সম্বন্ধে তাঁহার *India, What Can It Teach Us* গ্রন্থে (পৃ ১৩-১৪) লিখিয়াছেন যে, 'Take any of the burning questions of the day—popular education, higher education, parliamentary representation, codification of laws, finance, emigration, poor law, and whether you have anything to teach and try, or anything to observe and to learn, India will supply you with a laboratory such as exists nowhere else."

যে দেশের সম্বন্ধে মোক্ষমূলর ঐরূপ লিখিয়াছেন, সেই দেশে যে শিল্প কৌশল গ্রীকদের সাহায্য ব্যতীত উন্নতি লাভ করিয়াছিল তাহাতে বিস্মিত হইবার কোন কারণ দেখি না।

কোণার্ক বা কণারক

জগন্নাথের শ্রীমন্দিরের ১৯ মাইল উত্তর-পূর্বে কণারক অবস্থিত। ইহার অভ্রভেদী মন্দির এখন ভগ্ন প্রস্তর ও বালুকাস্তূপে পর্যবসিত। কপিল সংহিতোক্ত ষটতীর্থের মধ্যে ইহা এক তীর্থ বিশেষ। ইহার অপর নাম পদ্মক্ষেত্র বা অর্ক ক্ষেত্র—স্থানীয় লোকে ইহাকে কোণার্ক অর্থাৎ অর্ক বা সূর্যের কোণ বলিয়া অভিহিত করে। এই মন্দির সম্বন্ধে শাম্বপুরাণে উল্লেখ আছেঃ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পুত্র শাম্ব নারদের কৌশলে যোড়শ শত গোপিনীর জলবিহার সময়ে তথায় উপস্থিত হয়েন। ভ্রমক্রমে শ্রীকৃষ্ণ শাম্বের দুরভিসন্ধি সন্দেহ করিয়া শাপ প্রদান করিলেন। ইহাতে তিনি কুষ্ঠ রোগাক্রান্ত হয়েন। পরে মৈত্রেয়ারণ্য বা কণারকে উপস্থিত হইয়া সূর্যের উপাসনা আরম্ভ করেন। সূর্যদেব তাঁহার তপস্যায় প্রীত হইয়া তাঁহাকে বর প্রদান করেন। ইহাতে তিনি কুষ্ঠরোগ মুক্ত হয়েন। সূর্যদেব শাম্বকে বলিলেন, যে আমার মন্দির প্রতিষ্ঠা করিবে সে সনাতন লোক প্রাপ্ত হইবেঃ 'ক্ষিতৌ যে স্থাপয়িস্যন্তি তেষাং লোক সনাতনঃ।' ইহাতে শাম্ব সূর্য-মন্দিরের প্রতিষ্ঠা করেন। ইহাই কণারক সম্বন্ধে পুরাণোক্ত ইতিহাস। কত যাত্রী দুরারোগ্য রোগ হইতে মুক্ত হইবার জন্য কণারকে গমন করিত। এখনও এতদুদ্দেশ্যে অনেকে যাইয়া থাকে। কপিলসংহিতায় উক্ত আছে:

'মৈত্রেয়াখ্যং বনং মৈত্রেয়ং তপসার্জিতং।
যত্র গত্বা নরঃ শীঘ্রং মহদ্রোগাদ্বিমুচ্যতে॥'

কণারক হিন্দু ও মুসলমান উভয়েরই নিকট আদৃত ছিল। আবুল ফজলের মতে মহাত্মা কবীরকে এই স্থানে সমাধি দেওয়া হয় (Aeen Akbari, Gladwin's translation Vol II, P 15)। হিন্দুর নিকট ইহা অর্ক বা পদ্মক্ষেত্র। স্মার্ত রঘুনন্দন কৃত পুরুষোত্তম পদ্ধতিতে এই নিম্নলিখিত শ্লোকটি প্রাপ্ত হওয়া যায়ঃ

'বিরজা ক্ষেত্রমেকাম্রং কোণার্কং পুরুষোত্তমম।
সিদ্ধিস্থানং মুমুক্ষানাংমতাঃ সোপানপংক্তয়ঃ ॥'

কণারকের মন্দিরের বিমান বা বড় দেউল এক্ষণে ভূমিসাৎ হইয়াছে। স্টার্লিং সাহেব ১৮২০ অব্দে এবং প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত ফার্গুসন ১৮৩৯ অব্দে দর্শন করিয়া ভগ্ন বিমানকে ১২০ ফুট উচ্চ বলিয়াছেন। এখন তাহা একেবারে ভূমিসাৎ হইয়াছে। এক্ষনে সে বিশাল অভ্রংলিহ মন্দির প্রস্তর স্তূপে পরিণত ও লতা-গুল্মাচ্ছাদিত হইয়া অহিকুলের নির্জন আবাসস্থল হইয়াছে। এক্ষনে মন্দিরের জগমোহন মাত্র বর্তমান আছে। কৃষ্ণবর্ণ, অখণ্ডপ্রস্তর, অরুণ স্তম্ভ স্থানান্তরিত হইয়াছে।

কণারক মন্দির নির্মাণ সম্বন্ধে অনেকগুলি মত প্রচলিত আছে। স্টার্লিং সাহেব লিখিয়াছেন (Asiatic Researches Vol XV. P. 327) ১২৪১ খৃঃ অব্দে রাজা লাঙ্গোরা নরসিংহ দেব তৎমন্ত্রী সিবাই সৌত্রের তত্ত্বাবধানে মন্দির নির্মাণ করেন। পণ্ডিত উইলিয়াম হান্টার প্রকৃত কালনির্ণয় করিতে অসমর্থ হইয়া বলিয়াছেন (Hunter's Orissa Vol II. P 288) মন্দিরটি ১২৩৭ হইতে ১২৮২ অব্দের মধ্যেই নির্মিত হইয়াছে। কেননা মাদলা পাঁজীর মতে ১২৩৭ অব্দে রাজা নরসিংহদেব সিংহাসনে আরোহন করেন এবং ৪৫ বৎসর অর্থাৎ ১২৮২ অব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। অথচ আইন-ই-আকবরী প্রণেতা

মন্দির নির্মাণের কাল নির্ণয়

আবুল ফজল বলেন যে ইহা ৭৩০ বৎসরের পুরাতন মন্দির; অর্থাৎ প্রায় ৮৫০ অব্দে নির্মিত। ইহা হইতে বোধহয় যে এই স্থানে পূর্বে মন্দির ছিল; তাহা ভূমিসাৎ হওয়ায় নরসিংহদেব মন্দিরটি পুনর্নির্মাণ করিয়া দিয়াছেন।

মাদলা পাঁজীর মতও তাহাই। ইহাতে লিখিত আছে, 'এ রাজা অর্ক-ক্ষেত্ররে কোণার্ক দেবঙ্কু দেউল তোড়াইলে। এ রাজার মুদল, সপুচ্ছ নরসিংহেন ক্ষেত্রশ্বরেনাংশুমালিনঃ। প্রাসাদঃ কারিতো রাজ্ঞা শকে দ্বাদশকে শতে॥'

ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র ও ফার্গুসন-এরও এই মত। ফার্গুসন বলেন (History of Indian Architecture P. 426) যে ইহা নিশ্চয়ই খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীতে নির্মিত। তিনি বলেন যে স্থাপত্য শিল্পের নিম্নস্থানীয় আদর্শে নির্মিত পুরীর মন্দিরের পরে কখন শিল্প আবার এত উৎকর্ষে পৌঁছাইতে পারে না।

আর এক কথা এই যে স্থূল ও সূক্ষ্মভাবে নির্মাণ কৌশলের হিসাবে ভুবনেশ্বর ও কণারকের জগমোহনের সৌসাদৃশ্য অনেক; অথচ ইহার বিমানের কারিগরী দেখিয়া বোধ হয় যে, ইহা ভুবনেশ্বরের পরে অর্থাৎ সপ্তম শতাব্দীর পরে নির্মিত। সুতরাং ফার্গুসন-এর সিদ্ধান্তক্রমে এই দাঁড়াইতেছে যে, কণারকের মন্দির সপ্তম ও দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে কোন সময়ে নির্মিত হইয়াছে।

ঐতিহাসিক আবুল ফজল এই মন্দিরের ভগ্নাবশেষ দেখিয়া অতিশয় বিস্মিত হইয়া লিখিয়াছেন যে, 'এই বিরাট মন্দির দেখিয়া কেহ বিস্মিত না হইয়া থাকিতে পারে না। যে প্রাচীর ইহার চতুঃপার্শ্ব বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে তাহার উচ্চতা ১৫০ হস্ত এবং প্রস্থ ১৯ হস্ত। তোরণের সম্মুখে কৃষ্ণ প্রস্তর

আবুল ফজল কর্তৃক মন্দির বর্ণনা

নির্মিত ৫০ হস্ত উচ্চ এক স্তম্ভ দণ্ডায়মান। নয়টি ধাপ উঠিয়া এক প্রশস্ত, মুক্ত অঙ্গনে উপস্থিত হওয়া যায়। সেইখানে প্রস্তর নির্মিত এক খিলানের উপর চন্দ্র, সূর্য ও নক্ষত্রগণের খোদিত মূর্তি রহিয়াছে। সেই সকলের চতুর্দিকে নানা জাতীয় উপাসকদিগের মূর্তি খোদিত রহিয়াছে—কেহ মস্তকের উপর ভর দিয়া দণ্ডায়মান আছেন, কেহ বসিয়া আছেন, শয়ান অবস্থায় কেহ বা হাস্য করিতেছেন, কেহ ক্রন্দন করিতেছেন, কেহ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া আছেন ইত্যাদি। এই মন্দিরের নিকট আরও ২৮টি মন্দির আছে এবং কথিত আছে যে, এই স্থানে অনেক অনৈসর্গিক ঘটনা ঘটিয়াছিল।'

আবুল ফজলের উক্ত উদ্ধৃত কথাগুলি হইতে আমার একটি কথা মনে হইতেছে। আমি ভুবনেশ্বরান্তর্গত মুক্তেশ্বরের মন্দিরের সম্মুখে রক্তবর্ণ একখানি বালুপ্রস্তরে নির্মিত অপ্রশস্ত খিলান দেখিয়াছি। উহা একখানি প্রস্তর নির্মিত। মুক্তেশ্বরের তোরণ যেন কণারকের model বা ক্ষুদ্রাণুকৃতি।

আবুল ফজলের উদ্ধৃত কথাগুলিতে আমার তত বিশ্বাস হয় না। কেন না, বহিঃপ্রাচীর অত উচ্চ অর্থাৎ ১৫০ হস্ত কখনই হইতে পারে না। জগমোহনটি এখনও বর্তমান। ইহার বর্তমান উচ্চতা ১২৩ ফুট। প্রাচীর অত উচ্চ হইলে বহিঃদেশ হইতে জগমোহন নয়ন গোচর হইবে না এবং জগমোহন নয়ন গোচর না হইলে বিমানের শোভারও বিকাশ হইবে না। কেননা Contrast বা গুণবৈষম্য প্রদর্শন দ্বারা শোভার যে বিকাশ হয়, এই সহজ জ্ঞানের বিষয় নিশ্চয়ই সেকালের শিল্পীরা বিদিত ছিলেন। তবে একটি কথা আছে। আমরা আকবরীর অনুবাদ পাঠ করিয়াছি। গ্লডুইন সাহেব "enlit" বলিয়াছেন। মূল গ্রন্থে কি আছে তাহা অনুধাবন করিয়া দেখা আবশ্যক।

এক্ষণে কণারক ভগ্নস্তূপে পর্যবসিত। সকলই গিয়াছে, কেবলমাত্র জগমোহন বিদ্যমান। এই জগমোহনই স্থাপত্যে কিরূপ উৎকর্ষ সাধিত হইয়া-

ছিল তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। জগমোহনের দ্বারদেশের ধারে ক্লোরাইট প্রস্তরের উপর যে শিল্প খোদিত রহিয়াছে তাহা অতুলনীয়। বাক্যে প্রকাশ করা যায় না। ইহা দেখিলে তাজমহলে প্রযুক্ত বিশপ হেলার-এর সেই অমর কথাগুলি স্মরণ পথে উদিত হয়ঃ 'The Indians built like Titans and finished like Jewellers.' এই দ্বারদেশের শিল্পকলা সম্বন্ধে স্টার্লিং যাহা বলিয়াছেন তাহা প্রণিধানের যোগ্য ঃ

'The skill and labour of the best artists seem to have been reserved for the finely polished slabs of chlorite which line and decorate the outer faces of the doorways. The whole of the sculpture on these figures comprising men and animals, foliage and arabesque patterns, is executed with a degree of taste, propriety and freedom which would stand a comparison with some of our best specimens of Gothic architectural remains.'

কণারকের জগমোহনের সহিত ভুবনেশ্বরের জগমোহনের সৌসাদৃশ্য অনেক, কিন্তু কণারকের জগমোহন ত্রিতল দ্বারা বিভক্ত, এবং ভুবনেশ্বরের জগমোহন দ্বিতল বিশিষ্ট। ইহাতে প্রথমোক্তের বিশেষ সৌন্দর্য খুলিয়াছে।

কণারক ও ভুবনেশ্বরের জগমোহনের তুলনা

প্রথম ও দ্বিতীয় তলে ছয়টি করিয়া কার্ণিস ও তৃতীয় তলে পাঁচটি। প্রথম ও দ্বিতীয় তলের ব্যবধান স্থল লম্বভাবে উঠিয়াছে। ইহা ঠিক কুলঙ্গী বা খাঁজের ন্যায়; এই খাঁজের মধ্যে প্রস্তর মূর্তি স্থাপন করা হইয়াছে।

জগমোহন ভূমিতল হইতে ৬০ ফুট চতুরস্রাকারে উঠিয়াছে; এবং ইহার উপর হইতে ক্রমোচ্চ ছাদ উঠিয়াছে। যেখানে সমতলভাবে ছাদের আয়তন ২০

ফুট, সেইখানে লৌহনির্মিত কড়ি বা Wrought Iron Joists স্থাপিত করা হইয়াছে এবং তাহা প্রস্তরখণ্ড দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

ক্রমনিম্ন ছাদের ঢাল বা ক্রমনিম্নতা ৭/৮। তাহা হইলে ছাদের ক্রমনিম্ন বাহুর সহিত সমতল যে কোণ অঙ্কিত করে তাহার পরিমাণ লগ টেবিল অনুসারে প্রায় ৬৩ ডিগ্রি অর্থাৎ ৬০ ডিগ্রির কিছু উপরে। যদি পিরামিড-টিকে দ্বিখণ্ড করিয়া সেকসন টানা যায় তাহা হইলে সেকসন-এর elevation বা বহিরাকৃতি একটি সমদ্বিবাহু ত্রিভুজের মত দেখাইবে। এই সমদ্বিবাহু ত্রিভুজের সমান বাহুদ্বয়ের মান ভূমি বা base-এর মান অপেক্ষা সামান্য অধিক।

সমস্ত জগমোহনের ঠিক মধ্য দিয়া সেকসন টানিলে বোধ হইবে যেন একটি চতুরস্র লম্বভাবে রাখিয়া তাহার উপর একটি সমদ্বিবাহু ত্রিভুজ স্থাপন করা হইয়াছে। আমার বোধহয় সমবাহু ত্রিভুজ অঙ্কিত না করিয়া সমদ্বিবাহু ত্রিভুজ অঙ্কিত করা হইয়াছে বলিয়াই জগমোহনের বহিরাকৃতির সৌন্দর্যের বিকাশ হইয়াছে। জ্যামিতির ষষ্ঠ অধ্যায়ের অনুপাতানুসারে হিসাব করিয়া দেখা যায় যে লৌহনির্মিত কড়িগুলি প্রায় ৯০ ফুট ঊর্ধ্বে স্থাপিত করা হইয়াছে।

কড়িগুলি দৈর্ঘ্যে কুড়ি ফুট, দুই প্রান্তের প্রস্থ আট ইঞ্চি এবং মধ্যস্থল এগার ইঞ্চি। হিসাব করিলে বুঝা যায় এক একটি কড়ির ওজন একাত্তর মণ। স্টীম ইঞ্জিন, কলকারখানা কিম্বা লৌহ রজ্জুর উদ্ভাবনের অত পূর্বে একাত্তর মণ এক একটি কড়ি নব্বুই ফুট ঊর্ধ্বে কি করিয়া স্থাপিত করা হইয়াছে তাহা বিস্ময়ের বিষয়।

ইহা অপেক্ষা আরও আশ্চর্যের বিষয় এই যে এত বড় লৌহ কড়ি কি প্রকারে নির্মাণ করা হইয়াছিল। যাঁহারা metallurgy বা ধাতুবিদ্যা পাঠ করিয়াছেন তাঁহারা জানেন লৌহ প্রস্তুত করা কি দুরূহ ব্যাপার।

তখনকার শিল্পীদের লৌহের bloom বা পিন্ড প্রস্তুত করিবার জন্য steam hammer বা tilt hammer ছিল না, hot blast প্রস্তুত করিতে জানিতেন না, আধুনিক প্রণালীতে reverberatory furnace এবং cup and cone arrangement উদ্ভাবন করিতে জানিতেন না। অথচ এত বড় বড় লৌহখন্ড যে কি প্রকারে প্রস্তুত করিলেন ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়।

প্রাচীন ভারতবর্ষীয়েরা লৌহনির্মাণ করিতে জানিতেন। এতৎ সম্বন্ধে ১৮৭১ অব্দের ডিসেম্বর মাসের Engineer পত্রিকায় একজন ইউরোপীয় পন্ডিত যাহা বলিয়াছেন তাহা প্রণিধানের যোগ্য বিবেচনা করিয়া উদ্ধৃত করিয়া দিলাম ঃ

'Nothing heretofore brought to light in the history of metallurgy seems more striking, to the reason as well as the imagination, than this fact that from the remote time when Hengist was ruling Kent, and Cerdic landing to plunder our barbarous ancesters in Sussex, down to that of our third Henry, while all Europe was in the worst darkness, and confusion of the Middle Ages—when the largest and best forging producible in Christendom was an axe or a sword blade—these ancient peoples of India, the forerunners of those now so enfeebled and degraded, possessed a great iron manufacture, whose products Europe even half a century ago could not have equalled.'

দিল্লীর লৌহস্তম্ভ আরও বিস্ময়কর। এই দিল্লীস্তম্ভ সম্বন্ধে পন্ডিত ফার্গুসন যাহা বলিয়াছেন তাহা উদ্ধৃত করিলাম ঃ

'It opens our eyes to an unsuspected state of affairs to find the Hindus at that age capable of forging a bar of iron larger than any that have been forged even in Europe upto a very late date, and not frequently even now.' (History of Architecture p. 508). ইহাও কি হিন্দুরা গ্রীকদিগের নিকট শিক্ষা করিয়াছিলেন?

আর একটি কথা উল্লেখযোগ্য। পূর্বে বলা গিয়াছে যে, কড়িগুলির মধ্য স্থলের প্রস্থ ১১ ইঞ্চি ও দুই প্রান্তের প্রস্থ ৮ ইঞ্চি। ইহা দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, পূর্বতন শিল্পীরা applied mechanics বা ব্যবহারিক শিল্প বিজ্ঞানের তত্ত্বগুলি অবগত ছিলেন। আমাদের জানা আছে যে, কোন বস্তুর উপর যদি সমভাবে বরাবর সমতল ভার বা evenly distributed load প্রযুক্ত হয়, তাহা হইলে বস্তুটি মধ্যস্থলে বক্র হইবার চেষ্টা করিবে, এই বক্র হইবার চেষ্টা বা bending moment মধ্যস্থলে সর্বাপেক্ষা অধিক হইয়া প্রান্তের দিকে ক্রমে ক্রমে হ্রাস হইয়া লোপ প্রাপ্ত হইবে অর্থাৎ গণিতের ভাষায় bending moment-এর locus বা ভ্রমণপথ একটি ক্ষেপনী বা parabola। সুতরাং বস্তুটির বেধ মধ্যস্থলে অধিক করিয়া প্রান্তের দিকে অল্প করিতে হইবে। আশ্চর্যের বিষয় কড়িগুলিকে এরূপভাবে প্রস্তুত করা হইয়াছে!

পূর্বে বলিয়াছি জগমোহন ব্যতীত মন্দিরের সমস্তই ভূমিসাৎ হইয়াছে; ইহার অনেকগুলি কারণ দর্শিত হয়। অনেকে ভূমিকম্প ইহার কারণ বলিয়া নির্দেশ করেন। তাহা হইলে জগমোহন কখনই অক্ষুণ্ণ থাকিত না। আর এত বড় ভূমিকম্প হইয়াছিল তাহা যে লিপিবদ্ধ হয় নাই ইহাও আশ্চর্যের বিষয়। কোন পুরাতন পুস্তকে ভূমিকম্পের উল্লেখ নাই।

বজ্রপাতেও এতবড় মন্দির কখন ভূমিসাৎ হইতে পারে না; আর বিমান অপেক্ষা জগমোহনের উপর বজ্রপাত হইবার অধিক সম্ভাবনা, কেননা

জগমোহনের শীর্ষদেশে লৌহ বিদ্যমান। লৌহ তড়িৎ সঞ্চালক। আমার বোধ হয় ভিত্তি বসিয়া যাওয়াতেই মন্দির পড়িয়া গিয়াছে। বোধ হয় বালুকা-স্তরের নিম্নে যে কঠিন মৃত্তিকা আছে তাহার উপর ভিত্তি স্থাপনা করা হয় নাই বলিয়াই এইরূপ ঘটিয়াছে।

ইহাতে বিস্মিত হইবার কোন কারণই দেখি না। কেননা নব্য স্থপতি বিজ্ঞানাভিমানী পন্ডিতগণের নির্মিত অনেক প্রাসাদের দুর্দশা ইহা অপেক্ষাও শোচনীয়। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হল ভূমিতল হইতে মস্তকোত্তলন করিবার পূর্বেই ইতিমধ্যে ছয় ইঞ্চি পরিমাণ বসিয়া গিয়াছে। রাইটার্স বিল্ডিং, মিউনিসিপ্যাল অফিস, হাইকোর্ট ইত্যাদি ইহারই মধ্যে ফাটিয়া গিয়াছে, কোনটি বা বসিয়া গিয়াছে।

কণারক মন্দির ভূমিসাৎ হওয়ার কিম্বদন্তী

কণারকের মন্দির ভূমিসাৎ হওয়া সম্বন্ধে এক কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে; কথিত আছে যে, মন্দিরের শীর্ষদেশে কুম্ভপাথর নামক একখানি প্রকান্ড চুম্বক প্রস্তর ছিল। এই প্রস্তরের আকর্ষণী শক্তি প্রভাবে কত শত নৌকা ও অর্ণবযান সমুদ্রে নিমজ্জিত হইত। একবার কোন অর্ণবযানের যবন নাবিকেরা ক্রোধান্ধ হইয়া মন্দিরের শীর্ষদেশ ভগ্ন করিয়া তথা হইতে প্রস্তরখানি লইয়া চলিয়া যায়। যবনের সংস্পর্শে মন্দির অস্পৃশ্য হইল ভাবিয়া পুরোহিতরা বিগ্রহ লইয়া পুরীধামে গমন করেন এবং তথায় মন্দির স্থাপন করেন। জগন্নাথের মন্দির-সম্মুখে যে অরুণ স্তম্ভ রহিয়াছে ইহাই কণারকের অরুণ স্তম্ভ।

কণারকের মন্দিরান্তর্গত প্রস্তরগুলি Iron clamps বা লৌহবন্ধনী দ্বারা আবদ্ধ। গ্রাম্য লোকেরা লৌহের লোভে মন্দিরের প্রস্তরগুলি স্থানচ্যুত করিত

এবং পরে মারাঠাগণও এই মন্দিরের প্রস্তর দ্বারা পুরীর যাবতীয় মন্দির নির্মাণ করিয়াছেন।

অনেকে অভিযোগ করেন যে হিন্দু শিল্পীরা কল্পনাকুশল শিল্পকলায় উৎকর্ষলাভ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু শরীরগত যাথার্থ বা সঙ্গতি রক্ষা করিতে তেমন আগ্রহী ছিলেন না। স্বীকার করি গ্রীকেরা এ বিষয়ে হিন্দুদিগের অপেক্ষা অধিকতর উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিলেন। কণারকে কিন্তু এ বিষয়ে সমধিক উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। এখানকার শিল্প ঠিক যেন প্রকৃতির অনুকৃতি।

আবুল ফজল বলেন এই বিশাল মন্দির নির্মাণে উড়িষ্যা রাজ্যের দ্বাদশ বর্ষের রাজস্ব ব্যয়িত হইয়াছিল। এই মন্দির নির্মাণে কত সহস্র শিল্পী আপন আপন শিল্প-কৌশল পাষাণে চিরমুদ্রিত করিয়া রাখিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা করা অসম্ভব। এখন জগমোহন প্রশস্ত প্রান্তরে চির স্মৃতি বিজড়িত ভগ্ন পাষাণ স্তূপের মধ্যে বিশালকায় দৈত্যের ন্যায় দণ্ডায়মান। আমাদের আশঙ্কা এ দানবের গর্বমণ্ডিত শিরোদেশ অচিরেই ভগ্নস্তূপের সহিত মিশিয়া ধরণীর পদচুম্বন করিবে।

উড়িষ্যার প্রত্যেক মন্দির একটা অব্যক্ত বিষাদ-গাম্ভীর্যে ম্লান হইয়াছে; কিন্তু সেই বিষাদ-গাম্ভীর্য একটা 'মহামৌন অসীমতায়' নিখিল বিস্তৃত ভাব-জীবনের চিরচঞ্চল ভাব ও বিদ্রোহাগ্নিকে প্রশমিত করিয়া দেয়। ভগ্নপাষাণ স্তূপ এখনও আপনার জীর্ণবক্ষে যাহা বহন করিতেছে তাহাতে কালের নিষ্ফল আক্রোশই প্রকাশ পায়।

অধিকাংশ মন্দির হইতে দেবতা অন্তর্হিত হইয়াছে। দেবতাহীন মন্দিরের

দ্বারে কেহ আপনার আবেদন স্তুতি ও বেদনা জানাইতে আসে না। দেবতারাও বুঝি সমাধিমগ্ন হইয়াছেন। আবার বুঝি তাঁহাদের পূজার্চনার জন্য শুভ পুণ্যক্ষণের প্রতীক্ষা করিতেছেন।

যে সমস্ত পাষাণখণ্ড কল্পনাকুশলী শিল্পী কর্তৃক মন্দিরের শীর্ষদেশে স্থাপিত হইয়া অসংখ্য দেবতার চরণ চুম্বন করিত, দেবতারা আর বুঝি তাহাদের উপর প্রসন্ন নহেন। তাহারা প্রান্তরে, কাননে, পথে ঘাটে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ও অযত্ন-বিন্যস্ত হইয়া বেদনাবিবশ হৃদয়ে জীর্ণবক্ষে আপনার দুঃখ দৈন্য জ্ঞাপন করিতেছে। কিন্তু হায়! এই এক একখানি প্রস্তরে এক একটি জাতির ইতিহাস চিরমুদ্রিত হইয়া রহিয়াছে। প্রখর মধ্যাহ্নে রাখাল বালক এখন শ্যামস্নিগ্ধ বনচ্ছায়ে এই প্রস্তরের মসৃণ অঙ্কে কৌতুকহাস্যে বিশ্রাম লাভ করে। মূর্খ বালক বোঝে না যে সে দেবদুর্লভ রত্নবেদীর উপর রহিয়াছে।

মন্দির হইতে দেবতা অন্তর্হিত হইলেও সূক্ষ্ম শরীরে বিরাজ করেন। ইনি বেদোক্ত দেবতা 'যো দেবাগ্নৌ যোহপ্সু, যো বিশ্বং যো ভুবনমাবিবেশ'। কেননা তাহা না হইলে এই চিরস্মৃতি বিজড়িত দেবমন্দিরে প্রবেশ করিলে কোথা হইতে চেতনা প্রবাহ আসিয়া ব্যাকুল বাসনারাশিকে ভাসাইয়া লইয়া যাইত না।

পূর্বে দেবতার দ্বারে শুধু তীর্থযাত্রীর ক্রন্দন পৌঁছিত, এখন দেখিবে যে বিশ্বমর্মভেদী করুণ ক্রন্দনে মন্দির মুখরিত!